না, আর খেতে দেবে না দেখ্‌ছি। এ বাড়ী ছাড়্‌তে হ'লো।

শিবানীর মুখে একটা বিষাদের তড়িৎ বহিয়া গেল। আপনাকে সামলাইতে সামলাইতে ধীরকণ্ঠে কহিল, একটা দিন হয়ে গেছে ভাই।

কালীকিঙ্কর গম্ভীর হইতে চাহিয়া বলিল, ঢের হয়েছে, কথায় আছে না, গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা, এও তাই।

শিবানী লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সামান্য শারীরিক কষ্টের জন্য যদি না ভাবিয়া দেবরের আলাদা রাঁধিবার বন্দোবস্ত করিত, তাহা হইলে ত কোন কথাই থাকিত না। তাহা হইলে খাইতে বসিয়া কালীকিঙ্কর ত কোন কষ্টই পাইত না। দেবতা যেন তাহাকে আরও লজ্জিত করিবার জন্যই এই সময় ষষ্টিচরণকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। শিবানী আর মুখ তুলিতে পারিল না, মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ষষ্টিচরণ ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, কি হয়েছে রে?

অন্নগ্রাস মুখে পূরিয়া চিবাইতে চিবাইতে কালীকিঙ্কর ক্রোধ বিজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল, কেন, তা শুনে তোমার কি হবে?

ষষ্টিচরণ ভ্রাতাকে বেশ ভাল করিয়াই জানিত, তাই সে কথা গায়ে না মাখিয়া প্রফুল্ল মুখেই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কি বল্‌লি?

বল্‌ব আর কি, তুমি আপনার কাজে যাও।

শিবানী সে কথা উড়াইয়া দিতে গ্রীবা উত্তোলন করিয়া কহিল, আজ এত সকাল সকাল যে?

ষষ্টিচরণ পত্নীর অভিপ্রায় বুঝিল, তাই আর কালী-কিঙ্করকে কিছু না বলিয়া মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল, জেলায় আর যেতে হ'ল না, পথেই কাজ শেষ হয়ে গেছে, তাই ফিরে এলুম।

এই সময় বাহিরে কে ব্যগ্র কণ্ঠে ডাকিল, কালী, ও কালী বাড়ী আছিস্?

কালী চীৎকার করিয়া কহিল, কে রে, আমি খাচ্ছি, দাঁড়া, হ'লো বলে।

শিবানীর অন্তরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। এমন সময় তাহার দেবরকে কে ডাকিবে। এইমাত্র ত সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টি করিয়া সে গৃহে ফিরিয়াছে। তবে কি অন্য কেহ? কিন্তু বিপদ ছাড়া ত কেহই তাহাকে চায় না। সকলেই তাহার উদ্ধত প্রকৃতির জন্য অসন্তুষ্ট, এমন কি একদিন একটা তুচ্ছ ঘটনা লইয়া প্রতিবেশী নরহরি মিত্রের সাহায্যে সঙ্কটজনক মোকদ্দমা খাড়া করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই। এমন কি বিচারেও সঙ্গীন অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। হায় সেই সময় যদি তাহার বড় সাধের মাতৃদত্ত হারছড়া না থাকিত, তাহা হইলে—শিবানী আর ভাবিতে না পারিয়া নয়ন মুদ্রিত করিল। তারপর ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে গা, কারুর সঙ্গে—

অসমাপ্ত কথাটা অনুমানে বুঝিয়া লইয়া কালীকিঙ্কর বলিয়া উঠিল, তুমি আমায় তেমনই সুনজরে দেখ কি না। আমি কেবল মারামারি করেই দিন কাটাচ্ছি।

ষষ্টিচরণ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ও কি রে হতভাগা, কাকে কি বল্‌তে হয় জানিস্ না, ও যে তোর বৌদি, মায়ের সমান।

উঠান পার হইতে হইতে কালীকিঙ্কর কহিল, অতয় দরকার নেই, ও আদর শেষে সইতে পারলে হয়।

ষষ্টিচরণ সঙ্কুচিত ভাবে কহিল, কিছু মনে কর না শিবা।...

বাধা দিয়া শিবানী কহিল, ঢের হয়েছে গো মশাই, এখন জিরুবে চল।

তাহার মুখে একটা কৌতুকের আভা খেলা করিতে লাগিল।

২

নিস্তব্ধ রাত্রি। কালীকিঙ্কর পরিশ্রান্ত, কোন রকমে গৃহ সম্মুখে আসিয়া ডাকিল, দোর খুলে, ও গো শুনছ, দোরটা খুলে দাও না।

শিবানী তাড়াতাড়ি আসিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিল, কহিল, যা হোক লোক কিন্তু, আমি এ দিকে সমস্ত রাত ধরফড়

করে মর্‌ছি, সেই যে খেয়ে বেরিয়েছ, তারপর ত আর দেখাই নেই।

কালীকিঙ্কর শয্যার উপর ধপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া অবসন্ন ভাবে কহিল, কাজ সারা না হ'লে ত আর আস্‌তে পারি না।

জিজ্ঞাসুনয়নে শিবানী কহিল, কি করে এলে?

ওপাড়ার যদুকে পুড়িয়ে আসা গেল।

কে যদু, বিধুদির ভাই না কি?

হুঁ।

শিবানীর মুখে সমবেদনার রেখা ফুটিয়া উঠিল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, আহা, এই সে দিন বাপ মারা গেল আর মাস ফিরুতে না ফিরুতেই ছেলে গেল। ঘরে ত সেই এক রত্তি মেয়েটাকে নিয়ে রইল সেই হতভাগী।

শিবানীর মুখের উপর অলস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কালীকিঙ্কর কহিল, তারও একটা ব্যবস্থা করে এসেছি। অন্তত কিছুদিন তারা আমাদের বাড়ী থাক্‌বে। পরে যা হয় বন্দোবস্ত করলেই চলবে।

শিবানী চিন্তান্বিতা হইয়া পড়িল। এই রে, পাগল দেবর আবার কি কাণ্ড করিয়া বসিল! তাহাদের নিজেদেরই চলা দায়, তাহার উপর এ দুর্ম্মূল্যের বাজারে পরের বোঝা কেমন করিয়া বহন করিবে। এখন আর সে সব আলোচনা নিষ্ফল বোধে সে কোন প্রশ্নই আর করিল না, মুখে বলিল, খাবে না?

না, সে কাজটাও সেরে আসা গ্যাছে। ভাব্‌লুম, রাত দুপুরে আর জ্বালাতন কর্‌ব না, মনে মনে গালাগাল দেবে বই ত নয়; কেমন ভাল করি নি?

শিবানী বিষাদ কণ্ঠে কহিল, ভাল।

সে স্বরে চম্‌কাইয়া উঠিয়া কালীকিঙ্কর শিবানীর দিকে একবার চাহিল; তারপর কহিল, তবে যদি বল ত না হয় দুটো খেয়ে নি।

শিবানী কোন উত্তর করিল না, ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন ষষ্টিচরণ একটা চারা গাছে বেড়া দিতেছিল, হঠাৎ তাহার দৃষ্টি গৃহের দিকে আকৃষ্ট হইল, সে দেখিল, যদু চক্রবর্ত্তীর পত্নী ও কন্যাকে সঙ্গে লইয়া কালীকিঙ্কর বাড়ী ঢুকিতেছে। ষষ্টিচরণ বিস্ময় বিজড়িত কণ্ঠে ডাকিল, কালী!

আসছি, বলিয়া কালীকিঙ্কর অন্দরের দিকে অগ্রসর হইল। শিবানী তখন উঠানে গোবর দিতেছিল, সটান তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া সে কহিল, এই এদের এনেছি, তুমি দেখো।

শিবানী বিহ্বল নয়নদ্বয় এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত কালীকিঙ্করের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া পরমুহূর্ত্তে ধীরস্বরে অভ্যাগতাদ্বয়ের অভ্যর্থনায় তৎপর হইল। কালীকিঙ্কর দাদার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, কি বল্‌ছ?

ওদের নিয়ে এলি কেন রে?

অম্লান বদনে কালীকিঙ্কর কহিল, নইলে আর কি করি বল? কেউ নেই যেকালে, আশ্রয় ত একটু দিতে হবে।

উত্যক্তকণ্ঠে ষষ্টিচরণ বলিয়া উঠিল, এই মাগ্যি-গণ্ডার বাজারে নিজেদের দু-মুঠো জোটে না, কোন্‌ আক্কেলে ওদের নিয়ে এলি তাই শুনি?

উদাস দৃষ্টি জ্যেষ্ঠের উপর ন্যস্ত করিয়া কালীকিঙ্কর কহিল, মানুষের বিপদে মানুষ না দেখ্‌লেই বিপদ হয় দাদা, ভগবান্‌ আমাদের ভালই করবেন এতে।

৩

একপ্রকার লোক আছে যাহারা কাহারও নিকট উপকৃত হইলেও তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। বরং তাহা তাহাদের ন্যায্য পাওনা বলিয়া মনে করিয়া লয়। যদুর স্ত্রীর স্বভাবটাও কতকটা সেই ধাঁজের। কাজেই তিনি কালীকিঙ্করের উপকারটা নিঃস্বার্থ পরোপকার ভাবিয়া লইতে পারিলেন না, তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল—সুহাসিনীর রূপই আজ তাহাদের আশ্রয় দিয়াছে।

কন্যা সুহাসিনী কিন্তু এক লহমার জন্যও এ সব কথা ভাবিবার অবকাশ পায় নাই, এইটুকুই সে জানিত, নিরাশ্রয় পথের ভিখারী হইয়া যখন তাহারা আশার ক্ষীণ আলোক

অবধি দেখিতে পায় নাই, সেই সময় ওই উদার মহাপ্রাণ যুবক তাহাদিগকে আপন অঙ্কে তুলিয়া লইয়াছে। কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত।

সে দিন রবিবার। কালীকিঙ্কর একটা হাঁস আনিয়া শিবানীকে বলিল, এটা রেঁধে দাও ত।

শিবানী ধীর-কৌতুক ভরে কহিল, সে কথাটা ভুলে গেছ বুঝি, তখন যে কাটা-ছাগলের মত ছট্‌ফট্ করতে করতে মানসিক করেছিলে আর মাংস খাবে না!

কালীকিঙ্কর মনে মনে শঙ্কিত হইয়া পড়িল কিন্তু মুখে সে কথা প্রকাশ না করিয়া কহিল, তোমার মত ত জানতে চাই নি, রেঁধে দেবে কি না তাই শুনি?

শিবানী হাস্যতরঙ্গে দেবরের হৃদয়কে তরঙ্গায়িত করিয়া কহিল, আচ্ছা আমি না রেঁধে দিলে কে দেবে বল ত?

কালীকিঙ্কর কৃত্রিম মুখ ভার করিয়া কহিল, বটে, আমায় রেঁধে দেবে কে? আচ্ছা দেখ,—সুহা, ও সুহা, এদিকে একবার আয় ত।

সুহাসিনী প্রত্যহই তাহাদের এইরূপ কলহ দেখিয়া থাকে, কাজেই তাহার কেমন একটা ধারণা হইয়াছিল ইহা তাহাদের বিবাদ নহে বরং কৌতুক উপভোগ করিবার ইচ্ছা। সে কহিল, আমি কি রাঁধতে জানি, দিদিকেই দাও না।

হাততালি দিয়া শিবানী হাসিতে-হাসিতে কহিল, কেমন হয়েছে? আমি কি সাধে বলি কর্তার একটা ন্যাজ থাকলে—বুঝছেন ত—আর বলে কাজ নেই, সেই হতে হতো।

যদুর স্ত্রী সেই সুযোগে ঝড়ের মত উপস্থিত হইয়া কহিল, তোদের কি কোন আক্কেল নেই লা, বাছা আমার খেতে চাইছে আর তোরা তাকে ব্যস্ত করে তুলেছিস্? এস বাবা, আমি রেঁধে দেব, যতক্ষণ এ হাড় ক'খনা আছে তোমার ফাই ফরমাস আমাকেই করো আমি করে দেব। ভারী ত কাজ।

কালীকিঙ্করের কথাটা ভাল লাগিল না। সে হাঁসটাকে তুলিয়া লইয়া কহিল, না আজ আর খাব না।

কি জানি কেন তাহার মনে হইতেছিল, যাই হ'ক, আমাদের কথায় এমন করে কথা কইতে কেউ আসে কেন?

সুহাসিনীর মাতা মনে করিল, অভিমানেই সে খাইতে চাহিল না। অনুযোগ স্বরে কহিল, তোমরা এমন ধারা ক'র না, ছি!

শিবানী ছোট্ট একটী 'আচ্ছা' বলিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

৪

কালীকিঙ্করের উচ্ছৃঙ্খল মনটা কোন্ ফাঁকে সুহাসিনীর সহিত জড়াইয়া পড়িতেছিল, শিবানীর তীক্ষ্ণদৃষ্টির নিকট তাহা অজ্ঞাত রহিল না। সে কথা-প্রসঙ্গে ষষ্টিচরণের মত জানিতে পারিয়া নিপুণা ধাত্রীর মত কালীকিঙ্করকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিল, সুহার বে'টা যে দরকার হয়ে পড়েছে, ঠাকুরপো, সমস্ত মেয়ে আর কতদিন ঘরে রাখবে বল?

কালীকিঙ্করের অন্তরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে চাপা গলায় বলিল, আচ্ছা দেখা যাবে' খন।

শিবানী ধীর কণ্ঠেই বলিল, তোমার দাদাকে বলেছিলুম, কিন্তু তাঁর মত নেই।

কালীকিঙ্কর উৎকণ্ঠিতভাবে শুনিতেছিল, শেষের 'নেই' শব্দটা যেন বজ্রের মত তাহার বুকে বিদ্ধ হইল। সে এক মুহূর্ত্তের মত চুপ করিয়া থাকিয়া বিকৃত কণ্ঠে কহিল, রামঃ, আমার কি আর ক'নে জুট্‌ল না, তুমি ক্ষেপেছ নাকি? আর আমি কি তাই চাই!

কিন্তু তাহার অন্তরটা প্রতিপলেই বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে চাহিতেছিল। শিবানী সময় বুঝিয়া আর সে স্থানে দাঁড়াইল না। কালীকিঙ্কর বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল।

ষষ্টিচরণ ঘরে বসিয়া শিবানীর সহিত গল্প করিতে ছিল। কালীকিঙ্কর নিকটে আসিয়া কহিল, আজ সুহার বিয়ে ঠিক করে এলাম।

উৎসুক নয়নদ্বয় ভ্রাতার মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া ষষ্টিচরণ কহিল, কোথায়?

রাঘবপুরে। বিষ্ণু গাঙ্গুলীর ছেলের সঙ্গে।

খরচাপাতি আছে ত, কত চাইলে?

কালীকিঙ্কর চিন্তিত হইয়া পড়িতেছিল কিন্তু কে যেন তাহাকে ঠেলিয়া দিল, সে কহিল, বেশী নয়, শ' ছয়েক। তারও একটা বন্দোবস্ত করে আসা গেছে, নরামুদীর কাছে আমার বিষয় বিক্রি করে দিলেই পাওয়া যাবে 'খন।

সম্মুখে একটা বিষধর সর্প দেখিলে লোকে যেরূপ চমকিয়া উঠে, ষষ্টিচরণ তাহা অপেক্ষা অধিক বিহ্বল হইয়া পড়িল। সহসা পিতার অন্তিম অবস্থা মনে পড়িয়া গেল। মৃত্যুর কবলে পতিত ক্ষেত্রমোহন যখন যন্ত্রণা-কাতর হৃদয়ে আপনার শীর্ণ হস্ত দুইটী দুই পুত্রের মধ্যে ধরাধরি করিয়া বলিয়াছিল, দেখিস্ ষষ্টি, কালী ছেলেমানুষ, একটুও বুদ্ধি নেই, এর কোনও অনিষ্ট না হয়। সে বলিয়াছিল, আচ্ছা বাবা, আপনি নিশ্চিন্ত হোন, তার কোন কষ্ট হবে না। আর আজ—

সে বলিয়া উঠিল, ছশ' টাকা বইত নয়, তার জন্যে এত ভাবছিস্ কেন তুই হতভাগা। চল্ আমার সম্পত্তিটাও বাঁধা দিইগে, তা হ'লে আর বিক্রি করতে হবে না।

কালী কহিল, না দাদা, তোমার আর এতে জড়িয়ে কাজ নেই, একটা ফেউ ত রয়েছে সঙ্গে।

ষষ্টিচরণ বিজড়িত কণ্ঠে কহিল, তবে আর কেন, আমায় একেবারেই ছুটি দিয়ে দে না ভাই।

কালীকিঙ্কর আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। শিবানী গ্রীবা হেলাইয়া কহিল, আচ্ছা মশাই, সব তাতেই আমাকে টান কেন বল ত? যাও গো, আবার পাগল কখন কি করে বসবে তার চেয়ে টাকার বন্দোবস্তটা করে এসো।

উভয় ভ্রাতাই বাহির হইয়া গেল। শিবানী উদাস ভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। অশ্রুধারায় তাহার বক্ষবাস ভিজাইয়া দিল।

৫

ষষ্টিচরণ দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল, শিবানী নিকটে আসিয়া কহিল, চানটা করে এস না, বেলা যে পড়ে এলো।

ষষ্টিচরণ একটা দীর্ঘ নিশ্বাসে হৃদয়ের গভীর বেদনা লাঘব করিতে চাহিয়া কহিল, যাচ্ছি শিবানী, কিন্তু আর ত পারি না। তাগাদার ওপর তাগাদায় আমার পথে বেরুন ভার করে তুলেছে, আর তাদেরই বা দোষ দেব কি, এই দু বছরে সুদ হিসেবেও এক পয়সা দিতে পারলুম না। দিনের দিন বাড়তেই চলেছে।

অকুল সমুদ্রে পতিত হইলে মানুষের মন যেমন বিপন্ন-ভাবে জাগিয়া উঠে, শিবানীর মনের অবস্থা সেইরূপই হইয়াছিল। সান্ত্বনার সুরে কহিল, না হয় বিক্রি করে ফেল না। আশা ছিল, ধানটা হ'লেও কিছু দেনায় দেওয়া যাবে, তা ত হল না। সুহার তত্ত্ব-তালাস করতেই সব ফুরিয়ে গেল।

এমন সময় গম্ভীর মূর্ত্তিতে কালীকিঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার চেহারা দেখিয়া শিবানীর বুক দশহাত দমিয়া গেল। সে কহিল; এমন ভাবে যে?

না, না, তোমরা দেখ্ছি আমায় পাগল না করে ছাড়্বে না। শালার মাথাটা দুখানা করতে করতে রেখে এসেছি। শালা জানে না যে, কালী ধার করলেও কোন শালার তোয়াক্কা রাখে না।

লোকমুখে সে শুনিয়াছিল, পাওনাদার নাকি দাদাকে অপমান করিয়াছে তাই সে সটান তাহাদের মুদীর দোকানে প্রবেশ করিয়া শাসাইয়া আসিয়াছে—যদি ফের এমন ধারা শুনি, তবে তো শালাদের প্রাণে বাঁচ্তে হবে না।

ষষ্টিচরণ ভয়-বিহ্বল নেত্রে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া কহিল, কি করে এলি রে?

বিরক্ত কালীকিঙ্কর দাদার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, তুমিই ত জালালে আমায়, তখন বারণ শোন নি, এখন বেশ হয়েছে, অপমান করবে না, খুব করেছে। আমি আরও শিখিয়ে দেব'খন।

তাহার নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠিতেছিল, সে দ্রুত পদে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

আর কিছুদিন নির্ব্বিবাদে কাটিয়া গেল, অর্থ পাইবার আশা নাই দেখিয়া পাওনাদার নালিশ করিল। দশদিক

অন্ধকার দেখিয়া ষষ্টিচরণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। আপনার জন্য তাহার কোন চিন্তা ছিল না, কিন্তু পিতার আদেশ আর বুঝি রক্ষা হয় না ভাবিয়া সে ম্রিয়মান হইয়া গেল। বিপদ যখন আসে তখন সর্ব্বদিক দিয়াই আক্রমণ করে। মোকদ্দমার দুইদিন পূর্ব্বে কালীকিঙ্কর কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না! দেবতার চরণে কত আবেদন পড়িল, শিবানীর উত্তপ্ত নয়নজলে গৃহ-প্রাঙ্গন সিক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কোথায় কে!

ভোরের বেলায় বাহির হইতে হইবে। ষষ্টিচরণ ভগ্ন হৃদয় দু হাতে চাপিয়া ধরিয়া বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল, প্রজ্জলিত অগ্নি যেন ধীরে ধীরে পুড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন সময় কে বাহির হইতে ডাকিল, বৌদি!

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া ষষ্টিচরণ কহিল, কে রে, কালী এলি? খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গৃহে প্রবেশ করিয়া কালীকিঙ্কর কহিল, হ্যাঁ, বৌদি কোথায়?

শিবানী স্বামীর একান্ত অনুরোধে খাইতে বসিয়া অনর্থক ভাত লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহার কথা বলিবার শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। এতদিন পরে কালীকিঙ্কর তাহাকে তাহার ন্যায্য সম্পত্তি, সত্যকার অধিকার ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছে! সে চক্ষে আর কিছুই দেখিতে পাইল না, হাতড়াইতে হাতড়াইতে দরজার বাজুটা চাপিয়া ধরিয়া ভাঙ্গা গলায় কহিল, কোথায় গেছ্‌লেন আপনি?

কালীকিঙ্কর শিবানীর পায়ের উপর লুটায়া পড়িয়া কহিল, আজ আর কোন কথা নেই বৌদি, শুধু জেনে রেখো, তোমার কোলে ফিরে আসবার জন্যে, তোমাকে বৌদি বলে স্বীকার করবার জন্যে মরণের হাত থেকে ফিরে আস্‌তে পেরেছি।

ষষ্টিচরণ কহিল, পায়ে কি হ'ল রে?

কিছু না, বলিয়া কালীকিঙ্কর ছুটিয়া গিয়া শিবানীর উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইতে বসিয়া গেল।

৬

বিচার কার্য্য বসিয়াছে। আসামীর তলব হইল, ষষ্টিচরণ ও কালীকিঙ্কর আসিয়া কাঠগড়ায় দাঁড়াইল। বিচারপতির হৃদয়ে তড়িৎ ছুটিয়া গেল। তিনি বারকয়েক চশমাখানি পরিষ্কার করিয়া চক্ষু দুইটী ভাল করিয়া মুছিয়া কেবলই কালীকিঙ্করের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তারপর নোট বইখানি খুলিয়া কি দেখিয়া লইলেন; পরে আপনার পকেট হইতে একখানি চেক্ কাটিয়া দিয়া মোকদ্দমা শেষ করিলেন। একজন উকিলকে দিয়া টাকাটা জমা করাইয়া দিলেন। মুদী চলিয়া গেল এবং সকলের সম্মুখেই বিচারাসন হইতে নামিয়া আসিয়া কালীকিঙ্করকে বুকে তুলিয়া কহিলেন, "ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, এত শীগ্‌গীর তোমার দেখা পেলুম, আজ থেকে তুমি পঞ্চাশ টাকা করে আমার কাছে মাসোহারা পাবে। আর যখন বিপদে পড়্‌বে জানিও। বল, সঙ্কোচ কর্‌বে না?

আনন্দে কালীর গণ্ড বাহিয়া ধারা ঝরিয়া গেল, সে কহিল, আপনি মানুষ না দেবতা!

কিন্তু ষষ্টিচরণ কিছুই বুঝিল না, ইহা যেন একটা ভোজবাজীর মত তাহার চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিল। কালীকিঙ্করকে বার বার প্রশ্ন করিয়াও কিছু জানিতে পারিল না। কালীকিঙ্কর সমস্ত পথটাই নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছিল, যতই বাড়ী নিকট হইতেছিল ততই আরও অধীর হইয়া পড়িতে লাগিল, ক্রমে গৃহ-সম্মুখে আসিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া গিয়া শিবানীর পদধূলি মস্তকে লইয়া কহিল, বৌদি, বৌদি, আমরা জয়ী হয়ে ফিরে এসেছি, তবে তোমার আশীর্ব্বাদের জোরে, নইলে পার্‌তুম না নিশ্চয়।

আনন্দের আধিক্য চাপিয়া রাখা যায় না। শিবানী ধরাগলায় কহিল, আশীর্ব্বাদ করি, যেন এমনই ধারা জয়ী চিরকালই হও, কিন্তু কি করে কি হ'ল?

কালীকিঙ্কর বলিতে লাগিল, বড় ধিক্কার লেগেছিল বৌদি, দাদার অপমান চোখে দেখ্‌তে পারব না বলেই বেরিয়ে পড়্‌লুম কিন্তু সমস্ত দিনের পরে সন্ধ্যার সময় আর চল্‌তে পার্‌লুম না, অবসন্ন হয়ে একটা গাছের তলায় শুয়ে

পড়লুম। হঠাৎ একটা গোলমাল উঠল, চেয়ে দেখি, একজন সাহেবকে নিয়ে একটা ঘোড়া তীরের মত ছুটে আসছে। সাহেব কত চেষ্টা করছেন কিন্তু কিছুতেই তাকে বাগে আনতে পারছেন না, যত লোক সব ছুটে পালাতেই ব্যস্ত। বিপন্নকে উদ্ধারের দিকে কারুরই লক্ষ্য নেই, তোমরা গাছতলায় দাঁড়াবার আগে ত মরব ঠিক করেই ছিলুম তাই লাফিয়ে গিয়ে তার বল্‌গাটা চেপে ধরলুম। হঠাৎ বাধা পেয়ে ঘোড়াটা একটুখানি থম্‌কে দাঁড়িয়েছিল। সাহেব টপ্‌ করে নেমে পড়লেন, পরেই চেয়ে দেখলুম আমাকে উল্টে ফেলে দিয়ে ঘোড়াটা ছুটে বেরিয়ে গেল। যখন জ্ঞান হলো, দেখলুম, আমি সাহেবের বাসায়। সেদিন আর উঠতে পারলুম না, বিছানায় শুয়ে-শুয়ে কেবল তোমাদের কথাই ভাবতে লাগলুম, শেষে আর স্থির থাকতে পারলুম না, সাহেবের মত না নিয়েই পালিয়ে এলুম। আজ দেখি, তিনিই জজসাহেব। এখন আমরা তাঁর দয়ায় ঋণ-মুক্ত হয়েছি। আরও তিনি পঞ্চাশ টাকা করে মাসোহারা দেবেন বলেছেন। কিন্তু সেটা কি ভাল, আমি মনে করেছি, সমস্ত দিন ধরে দুই ভায়ে প্রাণপণে খেটে দিয়ে তাঁর ঋণশোধ করবার চেষ্টা করব। দু চার টাকা মাইনে হিসাবে নিতে হবে, নইলে চলবে না যে! তুমি রয়েছ, ঘরবাড়ী রয়েছে। এ কথাটা কিন্তু নিশ্চয় করে বলে, দিচ্ছি বৌদিদি, তোমাকে, আর বাড়ী-ঘর ছেড়ে আমরা স্বর্গে গিয়েও সুখী হতে পারব না।

শিবানী তখন আর এ মর-জগতে ছিল না, কোন অতীত যুগের কাহিনী স্মরণ করিয়া ভগবানের চরণে জন্ম-জন্ম এইরূপ দেবরের প্রার্থনা করিয়া সে কহিল, ঢের হয়েছে ভাই, এখন সত্যনারায়ণের পুজার যোগাড় করি গে চল। বাবা যেন এমনই করে তাঁর চরণে ঠাঁই রাখেন। আর দেখগো, তুমি গিয়ে পাড়ার সকলকেই আমাদের বাড়ী রাতে একবার পায়ের ধূলা দিতে বলে এস। চুপ করে বসে থাকলে আর চলবে না কারুরই, খাটতে হবে। ঠাকুরপো, তুমি অসাধ্যসাধন করতে পার। আজ সুহাস-দেরও যেমন ক'রে পার আনতে হবে ভাই।

ক্ষণিকের জন্য কালীকিঙ্করের মুখটা একবার পাংশু হইয়া গেল। তারপর কেমন যেন শ্রান্ত ক্লান্তস্বরে উত্তর করিল, আচ্ছা দেখি।

শিবানী যেন তাহার কথায় একটু ব্যথা পাইল। তাহার দীর্ঘনিশ্বাস পাছে কালীকিঙ্করের দেহে লাগে সেই জন্য মুখ ফিরাইয়া লইয়া জীবনে এই প্রথম কালীকিঙ্করের মাথায় হাতখানি বুলাইতে বুলাইতে বলিল, আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর ভাই। তাকেও আজ আনতে হবে—আজ যে তারও উৎসব। তোমার জন্যে তার কত আনন্দ হবে।

পলাতক

শ্রীদীনেশচন্দ্র লোধ

এক

রাত্রি তখন আন্দাজ সাড়ে চারটে, আমি ঘুমুচ্ছি। কে এসে চাপা গলায় ডাক্‌লে 'রবি রবি।' চোখ মেলে চাইতেই দেখি দিদি দাঁড়িয়ে। ঘরের চড়া আলোতে দিদির মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে পাচ্ছিলুম না। চোখ রগড়িয়ে উঠে বস্‌তেই দেখ্‌লুম, দিদির সদাহাস্য-শান্ত মুখটি যেন একটা নিশ্চিত আশঙ্কায় শুকিয়ে গেছে। লাফিয়ে উঠে মেঝেতে দাঁড়িয়ে বল্‌লুম, কি হয়েছে দিদি, এত রাত্তিরে আমায় ডাকৃতে এসেছ যে?—

দিদি ডান হাতটা একটু উপরে তুলে আমাকে চুপ করতে ইঙ্গিত করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে চেয়ে নিলেন। কিন্তু তাতেও যেন নির্ব্বিঘ্ন হয়েছেন ব'লে বোঝা গেল না, জানলা দিয়ে বাইরে ঝুঁকে একবার কি দেখলেন, তারপর নীচু গলায় বল্‌লেন, পুলিশে বাড়ী প্রায় ঘিরে ফেলেছে, চট্‌ করে জামাটা নিয়ে নে, এক্ষুনি বেরুতে হবে।

আমি যেন হঠাৎ দমে গেলুম, ধপ' করে আবার খাটে বসে পড়লুম, মাটীর দিকে চেয়েই বল্‌লুম, না দিদি আর কোথাও যাব না, এ ভাবে পালিয়ে পালিয়ে আর কদ্দিন থাকব, আমি ধরা দেবো, অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে।

দিদি কাছে এসে মুখটা তুলে ধরে বল্লেন, ছি কাঁদ্‌ছিস্? তারপর চোখ্ মুছাতে মুছাতে বল্লেন, ধরা দিয়ে জেল দ্বীপান্তর যাওয়া কি বীরত্ব ভাবিস্? নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে জেলে প'চে মরার চেয়ে পালিয়ে বেঁচে থাক্‌লে কোনও দিন হয় ত জগতের কোন কাজে লাগ্‌তে পারিস্। আর না জেনে একটা পাপ করেছিস, দশ জনের চক্ষে বা আইনের চক্ষে দোষী হলেও তুই ভগবানের কাছে ত নির্দ্দোষ। নে ভাই ওঠ্, দেরী করিস নে।

কিন্তু আমি কিছুতেই যেন নড়্‌তে পার্‌লুম না, বল্‌লুম, না দিদি আমি যেতে পারব না।

তখন দিদি নিরুপায় হ'য়ে বল্লেন, তুই না ভেবে ছেলে-মানুষী কচ্ছিস, তুই জেলে গেলে আমাদের দেখ্‌বে কে রবি?

দিদির এই কথাটায় যেন একটা কান্নার সুর বেরিয়ে প'ড়ল। বাঙ্গলার হিন্দু বিধবা নিরাশ্রয়া হয়ে যেন আজ এই ছোট ভাই-এর আশ্রয়ের জন্য এত কাঙ্গাল। আর ভাব্‌তে পার্‌লুম না, উঠে দাঁড়ালুম। নীচে এসে জামার পকেটে দিদি কয়েকটা নোট গুঁজে দিয়ে হাত বাড়িয়ে কিছু না বলে' পথ দেখিয়ে দিলেন। দিদিকে প্রণাম কর্‌লুম, দিদি আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন। যে পথে কোন দিন বিড়ালকুকুর ছাড়া অন্য কোন প্রাণীকে হাঁটতে দেখিনি সেই পথেই বাড়ীর বাইরে এসে পড়্‌লুম। বেরিয়ে ত পড়েছি, কিন্তু যাব কোথায়? কেন, এ ভাবে না বাঁচ্‌লে কি চল্‌ত না? না, বাঁচতে ত হবে, দিদি রয়েছে, ছোট ভাই ধীরু হয়েছে, আমি ছাড়া যে ত্রিজগতে তাদের আর কেউ নেই!

পা যেন আর চলছিল না। কোথায় যাব তার কিছু ঠিক নেই। কি হবে না হবে তার কিছু জানা নেই।

এ বাড়ীতে আর ফিরে আসা হবে কিনা তাও জানি না। এ সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে পথ চলেছি,—খানিক-ক্ষণ পরে দেখি, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নির্ব্বিঘ্নে অনেক দূর এসে পড়েছি। কিন্তু কে আমায় এতদূর এগিয়ে এনে দিলে? বাড়ী ছাড়লুম সত্যি কিন্তু কোথায় যাব, কি করব কিছুই ভেবে পেলুম না। ষ্টেশনে যাওয়া নিরাপদ নয় ভেবে সহর থেকে বেরুবার একটা রাস্তা ধরে অন্ধকারেই পথ চলতে লাগলুম।

তারপর এখানে দুদিন, সেখানে একদিন করে' নানা গ্রামে অতিথি হয়ে নির্ব্বিঘ্নে কিছুদিন কাটিয়ে দিলুম। এর জন্য কত মিথ্যে বলতে হয়েছে, কত প্রবঞ্চনা করতে হয়েছে আমিই জানি। কিন্তু কি করব বাঁচতে ত হবে। অনেক সময় মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু তখনই আবার সব ভু'লে গেছি দিদির সেই শেষ কথাটা ভেবে। তখন মনকে বলেছি, প্রবঞ্চনার এইমাত্র আরম্ভ; বাঁচতে হলে যে সে-ই একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু এ ভাবে আর কতদিন চলে? তারপর ছদ্মবেশে গ্রামে গ্রামে ঘোরাও তখন নিরাপদ ছিল না। গ্রামের ছেলেছোকরার দল সরকারের গুপ্ত-পুলিশ ভেবে অনেক-বার বেশ লাঞ্ছনায়ও ফেলেছে। মনে হ'ল কলকাতা বড় সহর, সেখানে প্রতিবেশী প্রতিবেশীর খোঁজ নেয় না, উপরের 'বাবু' নীচের দোকানদারকে চেনে না, সেখানে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে বেশী কষ্ট হবে না। তার পরই কলকাতায় এসে পড়লুম।

একটা ছোট গলিতে একটা নোংরা হোটেলে নাম বদলে এসে উঠলুম। হোটেল কর্ত্তাকে বললুম, চাকরীর উমেদারী করতে এসেছি। অসময়ের এই আশ্রয়ের জন্য তিনি যা চাইলেন তাই দিতে রাজী হয়েছি দেখে তিনি খাতির করেই আমার জন্য একটা ঘর ছেড়ে দিলেন। দিনগুলি এক রকম কাটছিল। হোটেলের বাবুদের সঙ্গে বড় একটা মিশি না, নিজের কাজে নিজেই ব্যস্ত থাকি। 'চাকরীর উমেদারীর' জন্য রাস্তায় বেরুতে বড় একটা সাহস হয় না।

দুই

এক দিন সন্ধ্যার পর একা ঘরে চুপ করে বসে আছি, ঘরে তখনও আলো জ্বালি নি। অন্যান্য দিনের মত সে দিনও জীবনের 'অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ' ভাবছি। হঠাৎ কানে এল কে কাকে জিজ্ঞেস্ কচ্ছে, রবীন্দ্র ঘোষ বলে এখানে কেউ থাকে মশায়?

শরীরের সকল রক্ত নিমেষে হিম হয়ে গেল, ঘরের অন্ধকারে চোখের অন্ধকার মিশে যেন আমাকে অন্ধ করে ফেলল। প্রশ্নের উত্তর হলো, না মশায় এই নামে ত কেউ এখানে থাকে না। তবে ম্যানেজার বাবুকে জিজ্ঞেস্ করবেন। কাল সকালে আসবেন, তিনি বেরিয়ে গেছেন।

কান পেতে আরও শুনতে চেষ্টা করলুম,—কিন্তু আর কিছু শোনা গেল না। মনে হলো আগন্তুক চলে গেছেন কিন্তু বিশ্বাস হলো না। উঠে গিয়ে যে দেখি, সে সাহস ও মনের বল তখন আমার ছিল না। এ ভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল। ঘামে সমস্ত গা ভিজে গেছে, তখনও পা কাঁপছিল।

দোরের খিলটা ভাল করে এঁটে দিয়ে আয়নায় মুখটা দেখে নিলুম। আজ প্রায় ছ'মাস ক্ষুরের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, তার উপর আবার রোজ দাড়ি কামিয়ে ছোটবেলা থেকে দাড়ি গোঁফের জেদ্ এমন বাড়িয়ে দিয়েছি যে, সুযোগ পেয়ে তারা আজ যেন জীবনের শোধটা তুলে নিচ্ছে। শত্রুকেও বাঁচতে দিলে কাজে লাগে এই কথাটাই সে দিন বেশী করে উপলব্ধি করলুম। অনিদ্রায় অনাহারে শুধু ভেবে ভেবে রাত্রি তিনটে অবধি হোটেলেই কাটালুম।

সুখে হোক্ দুঃখে হোক্ বাঁচতে হ'লে মানুষকে সকল অবস্থায়ই একটা না একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হয়। আমিও নিরাশ্রয় হয়ে তার অভাব খুব অনুভব করলুম। ছেঁড়া একটা ময়লা গেঞ্জি গায় দিয়ে হোটেল ছেড়েছি, উদ্দেশ্য চাকর হয়ে কোন বাড়ীতে আশ্রয় খুঁজে নেওয়া। কিন্তু কাজে নেবে বুঝতে পারলুম চাকরীর বাজার বাস্তবিকই

মন্দা। দু'তিন দিন খুব ঘোরাঘুরি হলো, যদিও বেশভূষা চাকরের মতই হয়েছিল তবুও প্রথম দিন রাস্তায় বেরুতে বড় ভয় হচ্ছিল। কিন্তু শেষকালে যখন আবিষ্কার করলুম যে, নিষ্প্রয়োজনেও রাস্তার লোকের চোখে চোখে চাওয়া পথ-চলা মানুষের একটা স্বভাব, তখন বেশ সাহস বাড়তে লাগল।

অবশেষে আশ্রয় জুটল; এক বড়-লোকের বাড়ীতে এক চাকরী পেলুম। বাড়ীর কাজকর্ম্ম যথাসাধ্য করি, গোলমালের ধার ধারি না, অন্যান্য ঝি-চাকরের সঙ্গেও বেশী কথাবার্ত্তা কইতে সাহস হয় না, দিন এক রকম কাটছিল মন্দ নয়। কাগজ পড়ার অভ্যেস ছোট বেলা থেকেই; তাই সুযোগ পেলেই দরজায় খিল দিয়ে বাবুর বৈঠকখানায় গিয়ে কাগজ পড়তুম। কথা বার্ত্তা কইতে খুব সাবধান হ'লুম, কি জানি কি বলতে কি বলে আবার ভাষার গোলমালে ধরা পড়ে যাই। মাসখানেকের মধ্যেই, বাড়ীর কর্ত্তা-পক্ষের সু-নজরে পড়ে গেলুম। আমার স্বভাব, অন্যান্য ঝি চাকর অপেক্ষা একটু ভিন্ন রকমের ছিল; তারা পোষ্ট কার্ড ছাড়া আর প্রায় সমস্ত জিনিষই বাজার হ'তে আনতে গেলে 'দালালী' ভোগ করত। কি-ই বা করবে, সেই মাত্র ছ'টা টাকায় মস্ত বড় একটা পরিবার ত পালতে হবে, আমার তেমন কিছু অভাব ছিল না বলেই আমি সকলের চোখে 'সৎ' হয়ে গেলুম। কর্ত্তা-পক্ষের আমার প্রতি এই সব নানা কারণে পক্ষ-পাতিত্ব ও অতিরিক্ত করুণা হয়ে উঠল চাকরদের হিংসা ও অবসরের আলোচনার বিষয়। কিন্তু তার মাত্রা চড়ে' গেল সে দিন যে দিন আমার জ্বর হ'লো। বাবু নিজে হুকুম দিয়ে আমার নির্দ্দিষ্ট আস্তানার ভিজে মেঝে থেকে আমার বিছানা করিয়ে দিলেন একটা ভাল ঘরের খাটের উপর, আর মেয়েকে ডেকে বল্লেন, দেখ্ মা অনু, এই 'জগা' বেচারার সংসারে কেউ নেই, সময় মত ঔষধ পথ্যটা যাতে পায় তার একটু দৃষ্টি রাখিস্ ত। আমার ত সময়ই নেই যে এ সব দেখ্‌ব।

যেমনে কথা তেমনি কাজ, সঙ্গে সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

ঝি চাকরের উপর কর্ত্তাদের এত অনুগ্রহ আমি আর কোথাও দেখি নি।

এত দিন আমি এখানে এসেছি, আমাদের কাউকে কোন দিন অত্যাচার সইতে দেখি নি। বেশ নিরাপদেই আমার দিন যাচ্ছিল, কিন্তু আমার কপালে সুখ কোথায়? এক দিন বাড়ীতে কানাকানি শুনতে পেলুম, আমাকে নাকি ইংরিজী কাগজ পড়তে কে দেখেছে। আর দেরী নয় পালাতে হলো। প্রাণের মায়ায় এমন দুর্ল্লভ আশ্রয়ও আমাকে ছাড়তে হলো।

ভাবলুম এত বড় বাংলাদেশে আমার স্থান নেই। দিদির দেওয়া পুঁজি এখনও হাতে কিছু আছে। তহবীলে যা ছিল সবটা দিয়েই লাহোরের টিকিট কিনে গাড়ীতে চড়লুম।

তিন

'হরেন্ বাবু' নাম নিয়ে শরৎ বাবুর বাড়ীতে প্রাইভেট টিউটারের কাজ নিয়েছি আজ প্রায় মাসখানেক হলো। বাংলার বাইরে এত দূরে এসে যেন এত দিনে একটু হাফ্ ছেড়ে বাঁচলুম। দাড়ী গোঁফ কামিয়ে নূতন 'চস্‌মা নিয়ে' দিব্যি বাবু সেজে গেছি। শরৎবাবু খুব ব্যবসায়ী, সোনার সংসার তাঁর, দুঃখ-তাপের আঁচও কোন দিন পরিবারে লাগে নি, নিজের হাল-মেজাজে মান সম্মান বজায় রেখে দিন কাটাচ্ছেন। আমার খোঁজ খবর নেওয়ার সময়ই বা তাঁর কোথায়? আমার পড়াবার গুণে তাঁর ছেলে দুটী নাকি এরই মধ্যে খুব উন্নতি করেছে, সে জন্য তিনি আমাকে বেশ স্নেহের চক্ষে দেখতেন।

কি বিপদ! যে ডালটা ধরি সে ডালটাই ভাঙ্গে! তবে বুঝি ভগবানের ইচ্ছে নয় আমি বাঁচি। সেদিন বড় ছেলেটী বিকেলে বেড়াতে গিয়ে বল্লে, কল্‌কাতা থেকে তার পিশেমশায়, তার অনু-দি'কে নিয়ে লাহোরে বেড়াতে আসছেন। তাদের এই অপরিচিত আত্মীয়ের সম্পূর্ণ পরিচয় যখন শুনলুম তখন আর বেড়াতে ভাল লাগছিল না, মনটা হঠাৎ জানি কেমন হয়ে গেল, এদের নিয়ে সন্ধ্যের আগেই ফিরে এলুম:—আজ আবার এক নূতন ভাবনা। আমার কি যে হবে কে জানে। রাত্তিরে ভাল ঘুম হলো

না। মন কিছুতেই বশ মানতে চায় না। আর নয় যথেষ্ট হয়েছে, এবার নিজেই পুলিশকে খবর দেব।

চিন্তার টানাটানিতে আমি উদ্ব্যস্ত, তখন হঠাৎ একদিন শরৎবাবু বল্লেন, মাষ্টারবাবু, আমার সঙ্গে ষ্টেশনে চলুন, আজ তাদের আস্‌বার কথা।

কোন দিন শরৎবাবুর কথা অবহেলা করি নি আজও অবাধ্য হতে সাহস হলো না। আমার কাল রাত্তিরেই যে পালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। যা হোক্, সাহসে বুক বাঁধতে চেষ্টা করলুম। না হয় তারা চিন্‌তেই পারবে, প্রতারক বলে ধরিয়ে দেবে, যা হয় হবে আর ভাবতে পারি না।

গাড়ীও এসে থাম্‌ল আমারও মাথা ঘুরতে লাগল। তখনকার মনের অবস্থা বলে বুঝাবার শক্তি আমার নেই। মুহূর্ত্ত পরে যে অপমান ভোগ করতে হবে তার চেয়ে ফাঁসি যাওয়াও যে ভাল ছিল। দিদি, তুমি আমার কি সর্ব্বনাশই করলে!

তাঁরা গাড়ী থেকে নাবলেন, আমার জিভ্ থেকে পাকস্থলী পর্য্যন্ত যেন জলশূন্য হয়ে গেল। বাকীটুকু পূর্ণ করলেন শরৎবাবু। তিনি আমাকে কাছে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কাঁপতে কাঁপতে অণিমার বাবাকে প্রণাম করলুম। এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা কইতে সাহস হয় নি, কে জানে গলার স্বর শুনে যদি তাঁদের সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়। সৌভাগ্য, মোটরে এসে তাঁরা তিন জনে পেছনের সিটে বসলেন, আমি ড্রাইভার হয়ে মোটরে ষ্টার্ট দিলুম। হাত ভয়ানক কাঁপছে, কতবার অন্য গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগাতে লাগাতে বেঁচে গেছি। এক দিন দুদিন করে সাতদিন কেটে গেল, কই তাঁরা ত আমায় চিনেছেন বলে মনে হলো না। কিন্তু প্রাণের আশঙ্কার আগুন তখনও নিব্‌ল না। সব সময় দূরে দূরে থাকি, ছেলেদের পড়াতে গেলে অস্বস্তি বোধ করি, বাইরে বাইরে ঘুরে দিন কাটাই।

আমাদের বেড়াবার সঙ্গী একজন বেড়েছে। বেড়াতে বেড়াতে অনেক কথাই হচ্ছিল, তখনও খুব সাবধান। অণিমা বল্লে, হরেনবাবু, আপনি বড় গম্ভীর, এত— আরও কি বল্‌তে যাচ্ছিল। আমার একটী ছাত্র বলে ফেল্‌ল, মাষ্টার বাবু আগে এমন ছিলেন না ত!

আমি ভাবলুম এই মাটি করলে দেখছি!

অণিমা বল্লে, আমি আপনাদের সঙ্গে বেড়াতে আসি আপনার আপত্তি থাকে ত—

কি পাগল, আমি কি এ কথা কোন দিন ভেবেছি! বরং আজকাল বেড়িয়ে যে আরও বেশী আরাম পাই। এ কথা কে বুঝ্‌বে! প্রকাশ্যে বল্লুম, না সে জন্য নয়, তবে বাড়ীর চিঠি অনেকদিন পাই নি, মনটা বিশেষ ভাল নয়। জানি না, কি করে এত বড় একটা মিথ্যে কথা ফস্ করে বলে ফেল্লুম। কথাটা যা'হোক্ চাপা পড়ে গেল। আমাকে যে বাঁচতে হবে এ কথা ভুললেও ত চল্‌বে না। দিদি আর ছোট ভাই-এর জন্য আমাকে যে বাঁচতে হবে। কিন্তু ভেবে পাই না, এ ভাবে বেঁচে থেকে তাদের কি কাজে আমি আস্‌ছি। এই আত্ম-প্রবঞ্চনার কি প্রয়োজন? আমি কারও জন্য বাঁচতে যাচ্ছি না। নিজের জন্যই যে আমাকে বাঁচতে হবে। নয় কি?

চার

আর দিন সাতেক পরে অণিমা চলে যাবে এই কথাটাই আজ ভাবছি। তা যাক্ না, আমার তাতে কি? কিন্তু এই কি আমার প্রাণের কথা? তারা প্রথম যখন এসেছিল তখন ভেবেছিলুম, পরের বাড়ী এসে কি করে লোক এতদিন থাকে, লজ্জাও নেই? কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, এত শীগ্‌গীর কলকাতা ফিরে যাওয়ার দরকার কি এদের? কলকাতা গিয়েই বা কি করবে? এই ত মাত্র দু'মাস হলো এসেছে। মনে পড়ে আজ সে দিনের কথা, আমি তখন তাদের বাড়ীর ছ'টাকা মাইনের চাকর। জ্বরের সময় তার সহানুভূতির দু'চারটে কথা, কত দয়া তার কোমল প্রাণে। অকৃতজ্ঞ আমি, তার সে করুণাও ভুলে গেছলুম। আবার কেন সে লাহোরে এসেছিল। সারা দুনিয়ায় লাহোর ছাড়া কি তার বেড়াবার যায়গা কোথাও জুটল না? অতীত ও ভবিষ্যৎ ভেবে আমি বর্ত্তমানকে যতই দূরে ঠেলে নিজেকে জাগিয়ে তুলতে চাই, সে ততই যেন

আমাকে সব ভুলিয়ে দিয়ে আরও আবিষ্ট করে তুলতে চায়। কেন তার এত দৌরাত্ম্য, আমি তার কি করেছি ?

* * * *

আমার হাত থেকে আয়নাটা কেড়ে নিয়েই অণিমা বলে উঠল, কে আপনাকে আয়না দিলে ?

বাস্তবিকই সে ভয়ানক রেগে গেছ্'ল। আমি বল্লুম, সত্যি অণিমা, আমাকে এখনও দেখলে চেনা যায় ?

চেনা যাবে না ? একবার যে দেখেছে সে-ই চিন্‌তে পারবে।

আমি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্‌লুম, আমি মনে ব্যথা পাব বলে সে সত্য গোপন কচ্ছে। আমি নিজেই ত দেখছি সমস্ত মুখের চামড়া কুঁচ্‌কে গেছে, নাক বসে গেছে, ঠোঁট দুটী তিনগুণ মোটা হয়ে উঠেছে। সৌন্দর্য্য বলে আমার কিছু কোন দিন ছিল না, কিন্তু আজ আমার যা আছে তাকে ত কুরূপ বল্লেও আমায় প্রশংসা করা হয়। স্বভাবত আমি একটু দুঃখিত হলুম, সঙ্গে সঙ্গে একটা নিশ্বাসও বেরিয়ে এল। অণিমাও গম্ভীর হয়ে আমার খাটেই মিনিট দশেক চুপ করে মাটীর দিকে চেয়ে বসে রইল। আমি কত কি আকাশপাতাল ভাব্‌তে লাগলুম। বাধ্য হয়ে মনকে সান্ত্বনা দিলুম, দেখ্‌তে বিশ্রী হয়ে গেছি কিন্তু আমার বেঁচে থাকবার পক্ষে যে এ আমার রক্ষা কবচ, আমাকে রবীন্দ্র ঘোষ বলে চিন্‌তে পারবে না। ডাকলুম, অণিমা!

তার কালো কালো বড় চোখ দুটী, জলে ভরে উঠ্‌ল। বল্লে, কেন ? আপনি আমার জন্য সব হারাতে বসে-ছিলেন ?

কেন ? তাহার উত্তর যে কেহই দিতে পারে না অণিমা ;—বলেই আমি তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সে চোখ মুছতে মুছতে উঠে গেল। আমার ছোট ছাত্রটীকে দিয়ে একটা পুরান খবরের কাগজ পাঠিয়ে দিল। সে ভেবেছিল, কাগজে আমার বীরত্বের প্রশংসা করে যা লিখেছে তা পড়ে আমি সান্ত্বনা পাব, যাহোক্ কাগজখানা পড়লুম। কি করে আগুনের ভিতর গিয়ে, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আমি অণিমাকে নির্ব্বিঘ্নে বাঁচিয়ে এনেছি, তারপর কি করে বাড়ীতে আগুন লাগ্‌ল, কখন নিব্‌ল, কি কি ক্ষতি হলো ইত্যাদি অনেক কথাই লেখা ছিল। কিন্তু তা পড়েও সান্ত্বনা পেলুম না। অণিমাকে ডেকে পাঠালুম কিন্তু সে এল না। আমি তখনও বিছানায় ; পোড়া ঘা তখনও ভাল শুকোয় নি। বাঁচ্‌বার আশা ছিল না বলে দিদিকে ও ধীরুকে তার করে আনিয়েছি।

তখন আমি একটু চলা-ফেরা করতে পারি, বাড়ীতেই পাইচারী করে বেড়াই। এই অগ্নি-কাণ্ডের পর অণিমাদের যাওয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রইল। সন্ধ্যের সময় দিদি ঘরে এলেন, সেখানে কেউ ছিল না।

দিদি বল্লেন, শরৎ বাবুর কি ইচ্ছে, শুনেছিস্ ?

আমি বল্লুম, কই না।

তাঁর ইচ্ছে অণিমার সঙ্গে তোর বিয়ে দেন, আমার মত চেয়েছেন, আমি কি বল্‌ব কিছুই ভেবে পাই নে।

অণিমার মত জেনেছ ? বলেই আমি উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলুম।

দিদি বল্লেন, তার মত জিজ্ঞেস করতে সে ত কেঁদেই সারা। বল্লে, আমার জন্যই ত তাঁর মুখে চিরদিনের মত এই পোড়া দাগ্ থাকবে দিদি, আমার কি একটা কর্ত্তব্যও নেই ? তুমি আমাকে এত নীচ ভাব দিদি ?

আমি যেন উৎসাহিত হয়ে বল্লুম, কিন্তু তার আগে সব কথা খুলে বলা দরকার দিদি। এ নিয়ে প্রতারণা করা ভাল হবে না।

আমার এই অসঙ্গত উৎসাহ দেখে দিদি বল্লেন, সে যাই হোক্, তোকে যে এখনও চেনা যায় রবি! পুলিশ যে যে এখনও হাল্ ছেড়ে দেয় নি ভাই, তার কি হবে ?

দিদি আর কথা বল্‌তে পারছিলেন না। আঁচলে মুখ ঢেকে বেরিয়ে গেলেন। ভাবলুম, না ভেবে আমি কি ভুলই করতে যাচ্ছিলুম। চিরদিনের মত এই সরলা বালিকার কি সর্ব্বনাশই না করতে বসেছিলুম। সে হয় ত তার প্রাণ ভরা বিশ্বাসে আমার উপর সব সঁপে দিয়ে বসে আছে, আমার কি এখানেও প্রতারণা সাজে ?

তারপর একদিন অণিমাকে কাছে ডেকে বল্লুম, একটা কথা ব'লব অণিমা, মনে রেখো কাউকে ব'লতে

পাবে না। বিশ্বাস-ভরা মন তার, সে বল্লে, 'বলুন ব'লব না।

আমি একে একে আমার জীবনের ইতিহাস তাকে খুলে বল্লুম। আমিই যে তাদের বাড়ীর চাকর ছিলুম সে কথা শুনে সে অবাক হয়ে গেল কিন্তু সত্যি প্রমাণ করতে বিশেষ কষ্ট হয় না। নীরব নিস্পন্দ হয়ে সে কেবল আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগ্‌ল। বল্লুম, আমি খুনে-আসামী, ধরা পড়লে, আমার ফাঁসী হবে, আমায় মাপ করো, আমি তোমার অনুপযুক্ত। আশীর্ব্বাদ করি, জীবনে সুখী হও।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে আমি বাইরের দিকে তাকালুম।

সে বল্লে, এর হাত থেকে উদ্ধারের কি কোন উপায়ই নেই?

বল্লুম, অন্তর্য্যামী জানেন।

সে চলে গেল। তারপর যত দিন সেখানে ছিলুম অণিমা আর বড় আমার চোখে পড়ত না। অভিমানিনী, কি ব্যথাই দিয়েছি আমি তার প্রাণে।

দিদিকে বল্লুম, এখানে আর থাকব না, অদৃষ্টে যা আছে হবে, চল বাড়ী যাই।

বাড়ী আর যেতে হলো না। যমের বাড়ী চল্লুম। দিদির লাহোরে আসাই গ্রেপ্তারের কারণ হলো। পর দিন সকলকে আশ্চর্য্য করে "খুনের আসামী" বলে পুলিশের সঙ্গে সকলকে ছেড়ে চল্লুম। যাবার সময় দেখলুম, দিদি দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন, অণিমা তাঁর কাঁধে হাত রেখে আমার দিকে চেয়ে আছে। দুজনের চোখ দিয়েই জল গড়িয়ে পড়ছে।

শুনলাম, শরৎ বাবু আমার জন্য উকীল ব্যারিষ্টার দিয়েছেন। আদালতেও তাই দেখ্‌লাম। দীর্ঘদিনের পর বিচারক ও জুরীর বিচারে আমি নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হলাম। বুঝ্‌লাম, তদ্বিরের ফল!

যে দিন মুক্তি পেলাম, সে দিন মনে হল, আজ সত্যই আমার চরম শাস্তি হল। আমি যে সত্যই খুনী অপরাধী! খুন আমি করে ছিলাম, এ কথা সত্য, তার যে কারণই থাকুক না কেন। তার পরেই মনে হল অণিমার কথা, দিদিদের কথা! অণিমাকে আমি দেখা দেব না। তার কাছে আমি চিরদিনের জন্য দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাই। দিদিদের কথা? এখন শরৎ বাবুদের সঙ্গে, অনিমার বাবার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তাঁরা দুটি প্রাণীকে আশ্রয় দেবেনই কিছুদিনের জন্য। আবার পালাই —এবার অণিমাকে বাঁচাবার জন্য।

শরৎ বাবুদের বাড়ী এসে পৌছলাম। কি আনন্দ সকলের। অণিমারা, দিদিরা সকলেই আমার বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন।

এখানে আবার বিচার! অণিমার বাবা প্রভৃতি সকলেই আমার শাস্তি সাব্যস্ত করলেন।

অণিমার সঙ্গে দেখা করলাম। কিন্তু আজও তাকে বোঝাতে পারলাম না।

নিজের মনকে জান্‌তাম, তাই এত কষ্ট সত্বেও— পারলাম না অণিমাকে আমার সঙ্গে জড়াতে।

তাই আবার প্রবঞ্চনা করে পালাতে হল। চিঠি লিখে রেখে গেলাম, অণিমা, ক্ষমা করো, আমি আর এক জনকে ভালবাসি।

পুলিশের চাইতে এ মিথ্যা আমাকে আরও উত্যক্ত করত। কিন্তু তবু আমি পলাতক!

গজল্ গান

নজরুল ইসলাম

(ভৈরবী—পোস্তা)

বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল্‌শাখাতে দিস্ নে আজই দোল।
আজো ফুল্-কলিদের ঘুম টুটে নি তন্দ্রাতে বিলোল॥

আজো হায় রিক্ত শাখায় উত্তরী বায় ঝুর্‌ছে নিশিদিন।
আসে নি দখ্‌নে হাওয়া গজ্‌ল্-গাওয়া মৌমাছি বিভোল॥

কবে সে ফুল্‌কুমারী ঘোম্‌টা চিরি আস্‌বে বাহিরে।
শিশিরের্ স্পর্শ সুখে ভাঙ্‌বে রে ঘুম রাঙ্‌বে রে কপোল॥

ফাগুনের মুকুল-জাগা দুকূল-ভাঙা ছুট্‌বে ফুলেল্ বান।
কুঁড়িদের ওষ্ঠপুটে লুট্‌বে হাসি ফুট্‌বে গালে টোল॥

বেদনায় গাইবে বাঁশী বন্-উদাসী ভীম্‌পলাশী সুর।
কিশোরীর্ লাজ্‌বিশরি ফুট্‌বে আধো বাধো বাধো বোল॥

কবি তুই গন্ধে ভুলে ডুব্‌লি জলে কূল পেলি নে আর।
ফুলে তোর বুক ভরেছে আজ্‌কে জলে ভর্‌বে আঁখির কোল॥

কৃষ্ণনগর
৮ অগ্রহায়ণ ৩৩

গজল্ গীতি

নজরুল ইস্‌লাম

মৃদুল বায়ে বকুল-ছায়ে
গোপন পায়ে কে ঐ আসে।
আকাশ-ছাওয়া চোখের চাওয়া,
উতল হাওয়া কেশের বাসে॥

ঊষার রাগে সাঁঝের ফাগে
যুগল তাহার কপোল রাঙে।
কমল দুলে সুরয্ শশী
নিশীথ-চুলে আঁধার রাশে॥

চরণ-ছোঁওয়ায় পাতার ঠোঁটে
মুকুল কাঁপে কুসুম ফোটে।
আঁখির পলক- পতন-ছাঁদে
নিশীথ্ কাঁদে দিবস হাসে॥

নয়ন-আসার কপোল-তলে
অথই পাথার সাগর দোলে।
ঋতুর ঝাঁপি দখিন করে,
আলোর সরে চরণ ভাসে॥

গ্রহের মালা অলখ্-খোঁপায়,
কপোল শোভে তারার টোপায়।
গোলাব-কাঁটায় আঁচল বাধে,
রুমাল লুটায় সবুজ ঘাসে॥

সাঁঝের শাখায় কানন-মাঝে
বালার বিহগ কাঁকন বাজে।
জীবন তাহার সোনার স্বপন
দোলায় ঘুমায় শিশুর পাশে॥

তোমার লীলা- কমল্ ক'রে,
নিখিল-রাণী, দুলাও মোরে!
দুলাও আমার সুবাসখানি
তোমার মুখের মদির্ শ্বাসে॥

১১ পৌষ' ৩৩

টল্‌স্‌টয়ের স্মৃতি

[ম্যাক্‌সিম গর্কির লেখা, 'লণ্ডন মার্কারি' থেকে অনূদিত]

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

টুর্গেনিভ ও তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী রুশ-লেখক ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলেই টল্‌স্‌টয়ের চোখে মুখে একটা দীপ্ত ঔজ্জল্য ভেসে উঠত। সমসাময়িক সাহিত্য-সেবী ও লেখকদের তিনি নিজের ছেলের মত স্নেহের চোখে দেখতেন, তাদের দোষগুণ সবই তাঁর জানা ছিল। মুক্তকণ্ঠে যেমন তাঁদের গুণের প্রশংসা করতেন, দোষত্রুটির জন্য তিরস্কারও তেমনি স্বমুখে করতে ছাড়তেন না। তাঁর তিরস্কার পরম লোভনীয় বলেই তাঁরা মনে করতেন।

ডস্‌টয়ভ্‌স্কির কথা উঠলেই তিনি কেমন যেন একটা সঙ্কোচ বোধ করতেন। এঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে চাইতেন না, যা-কিছু বলতেন, তাও যেন নিতান্ত অনিচ্ছায়।* ডস্‌টয়ভ্‌স্কির সম্বন্ধে বলতেন, কন্‌ফিউসিআস্‌ ও বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলে তাঁর মনের সে নিদারুণ উগ্রতা ও তীব্রতা অনেকটা কম হত। তাঁর রক্তমাংসের মধ্যেই যেন কেমন একটা প্রচণ্ড বিদ্রোহের ভাব ছিল। ক্রোধ হলে, তাঁর দেহের শিরা উপশিরাগুলি স্ফীত হয়ে উঠত, কর্ণমূল পর্য্যন্ত কাঁপতে থাকত। তাঁর অনুভূতিশক্তি ছিল অসাধারণ, কিন্তু চিন্তার প্রাচুর্য্য যথেষ্ট ছিল না। কোন কোন বিষয়ে তাঁর স্বভাবটা ছিল অনেকটা ইহুদীদের মত; তিনি তাদেরই মত অকারণে সন্দেহাকুল, উচ্চাভিলাষী, মূর্ত্তিমান বিষাদ ও অদৃষ্টের হাতের পুতুল। কেন যে লোকে তাঁর লেখার এত আদর করে আমি তার মানে বুঝি নে, তাঁর বইগুলি আমায় অত্যন্ত পীড়া দেয়, তাঁর বেশীরভাগ বই-ই আমার ভালো লাগে না। তার কারণ তাঁর 'ইডিয়ট্‌স্‌,' 'র‍্যাডোলেসেণ্ট', 'রাস্‌কলনিকভ্‌'-এর মধ্যে এতটুকু বাস্তবতা নেই। এ বইগুলি নেহাৎ সাধারণ, আর বুঝতে খুব সহজ। আমার ত ভারী দুঃখ হয় যে, লোকে লিস্‌কভ্‌-এর লেখা কেন পড়ে না। সত্য সত্যই তাঁর লিখ্‌বার শক্তি অসাধারণ। তুমি তাঁর লেখা পড়েছ?

আজ্ঞে হাঁ। তাঁর বই আমারও ভারী ভালো লাগে। বিশেষ ক'রে তাঁর ভাষা।

ভাষার উপর তাঁর অসাধারণ দখল। তাঁর লেখা তোমার ভালো লাগে? আশ্চর্য্য! তুমি ঠিক রুশ নও, তাই তোমার চিন্তাও ঠিক রুশীয় নয়। আমার কথায় রাগ করলে? আমি বুড়ো হয়েছি, এ কালের তোমাদের লেখা হয়ত আমি বুঝতে পারি নে, কিন্তু আমার যেন কেমন মনে হয় যে এ যুগের তোমাদের সাহিত্য খাঁটি রুশ-সাহিত্য নয়। এ কালের কবিতা কেমন যেন এক অদ্ভুত রকমের, আমি তার কিছুই বুঝি নে। কবিতা

---

* টল্‌স্‌টয়ের 'What is Art' নামক বইতে ডস্‌টয়ভ্‌স্কির লেখা, বিশেষ করে তাঁর 'Memoirs from the House of Death' নামক বইয়ের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। এই বইখানাকে আর্টের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন ও ভগবৎপ্রেমের উৎস বলে বর্ণনা করেছেন।—অনুবাদক।

ম্যাক্‌সিম গর্কি
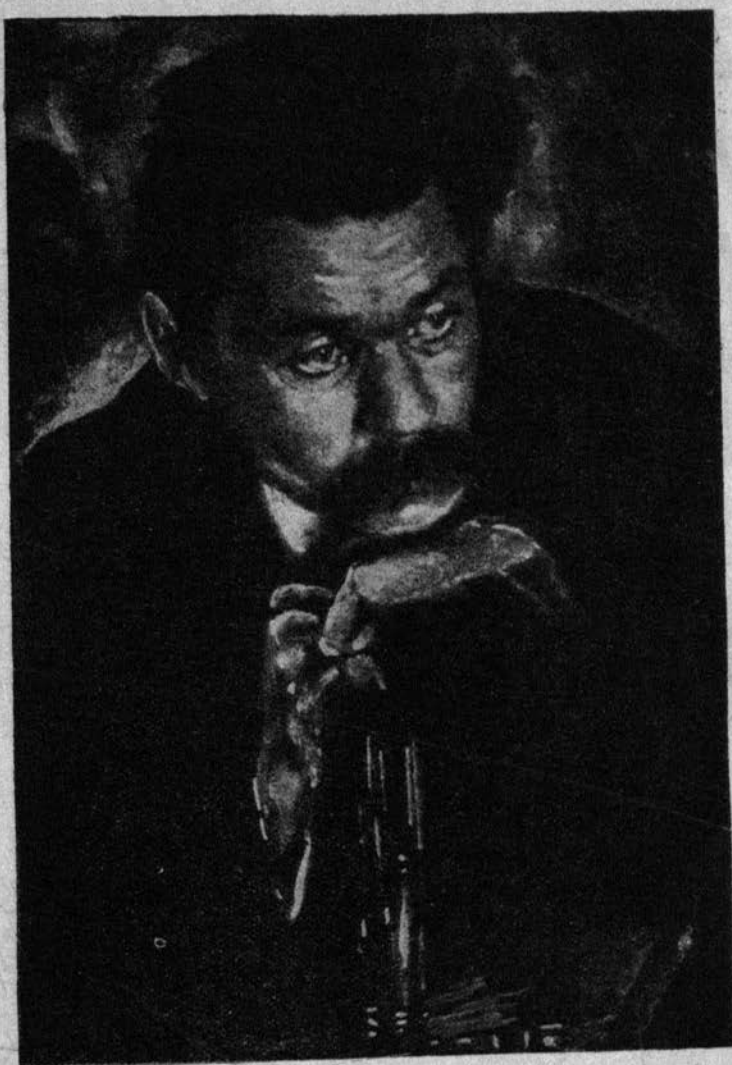
লিখতে হলে পুষ্‌কিন, টিয়াশেভ্‌, ফেট—এঁদেরই আদর্শ বলে নেওয়া উচিত।

শেখভের দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লেন, তুমি রুশ, একেবারে খাঁটি রুশ।

শেখভকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। শেখভের দিকে স্নেহ কোমল দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ স্নেহধারায় বুলিয়ে দিতেন। একদিনের কথা মনে আছে। সেদিন আমরা ক'জন তাঁর বাড়ী গিয়েছি। শেখভ, আলেকজাণ্ডার লভ্‌নরের সঙ্গে 'লনে' পাইচারী করছেন। টল্‌স্টয় তখন অসুস্থ, তিনি বারান্দায় একটি আরাম চৌকিতে গা এলিয়ে বসে আছেন। অনেকক্ষণ শেখভের দিকে তাকিয়ে থেকে অনুচ্চস্বরে বল্লেন, কি খাসা ছেলে এই শেখভ। নারীর মত স্নিগ্ধ, কোমল, মধুর। হাঁটাও যেন মেয়েদেরই মত। ছেলেটি অসাধারণ!

তাঁর বাড়ীতে তাঁর ভক্তদের আমি বহুবার দেখেছি। তাঁদের দেখে আমার কেবল এই কথাটাই মনে হয়েছে যে, তুচ্ছ স্বার্থ, ভণ্ডতা, কাপুরুষতা অর্থলিপ্সা দিয়ে তারা যেন গোটা বাড়ীটাকে কলুষিত ও অশুচি করে রেখেছে। রুশিয়ায় এক রকমের দরবেশ আছে, তারা পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, তারা কুকুরের হাড়কে সাধু মহাত্মার দেহাবশেষ বলে সাধারণ লোকদের ঠকিয়ে বেড়ায়। এ জাতীয় আরো অনেক রকম মিথ্যে চাতুরী দিয়ে তারা লোককে প্রতারিত করে। টল্‌স্টয়ের ভক্তরাও ছিল কতকটা তাদেরই মত। একবার তাঁর বাড়ীতে আমি তাঁর এক ভক্তকে ডিম খাওয়াতে পারি নি, অথচ সেই ব্যক্তিকেই ষ্টেশনে পরম তৃপ্তির সঙ্গে মাংস খেতে দেখেছি। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলুম, সে বলেছিল, বুড়ো বড় বেশী বাড়াবাড়ি করে।

তিনি যে তাঁর এহেন ভক্তদের সম্বন্ধে একেবারে কিছুই জানতেন না তা অবশ্য নয়, তিনি তাদের বেশ ভাল করেই চিনতেন। টল্‌স্টয়ের শিক্ষাদীক্ষায় তার প্রাণকে কত উন্নত ও পবিত্র করেছে, উচ্ছ্বসিত হয়ে তা একবার তাঁর এক চেলা বর্ণনা করছিল। টল্‌স্টয় আমার পাশেই বসে ছিলেন, আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্লেন, হতভাগা যা বলছে, তার আগাগোড়াই মিথ্যে, ভেবেছে এতে আমি খুশী হব। মূর্খ!

তিনি ইচ্ছা করলে লোকজনদের আলাপে সালাপে অতি সহজেই মুগ্ধ করে' ফেলতে পারতেন। এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী বৈঠকী লোক। সহজ সরল এবং মার্জ্জিত ভাষায় কথা কইতেন। কিন্তু সময় সময় তাঁর কথাবার্ত্তা আমায় অত্যন্ত পীড়া দিত। স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে কথা উঠলেই তিনি অকথ্য কদর্য্য ভাষা ব্যবহার করতেন। মেয়েদের উপর তাঁর যেন একটা অস্বাভাবিক আক্রোশ ও তীব্র বিদ্বেষ ছিল। হয় ত কোন মেয়ে এমন কোন অন্যায় করেছে যা তিনি জীবনে কখনো ভুলতে পারেন নি এবং তা সমগ্র নারীজাতির উপর তাঁহাকে বিরূপ করে তুলেছে।

একবার আমরা জন কয়েকে মিলে বসে বসে মেয়েদের সম্বন্ধে গল্পসল্প করছিলুম, তিনি অদূরে দাঁড়িয়ে তাই শুনছিলেন। হঠাৎ আমাদের সুমুখে এসে বলে উঠলেন, মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি মেয়েদের সম্বন্ধে সত্যি কথা বলব। শেষ নিমেষপাতের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বলে যাব, এবার যা করবার করতে পার।

আমার যেন কেন মনে হত যে, সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর আর তেমন অনুরাগ নেই। অনেকটা তা সত্যও বটে। কিন্তু লেখকদের জীবনের কথা জানবার জন্যে তাঁর আশ্চর্য্য কৌতূহল ছিল। কে কেমন লোক, কোথায় তার জন্ম, কি করে? ইত্যাদি প্রশ্ন তাঁর মুখে প্রায়ই শুনা যেত, এদের সম্বন্ধে আলাপ করলে তাঁর কাছ থেকে কোন-না-কোন নূতন তথ্য জানা সহজ ছিল।

কখন্ কি পড়ি বা লিখি সে সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই খবর নিতেন। আমি পড়ছি এমন কোন বই তাঁর পছন্দ না হলে তিনি আমায় তিরস্কার করতেন।

তিনি বলতেন, কাস্‌টমারভের অনেক নীচে গীবনের স্থান। সকলেরই মম্‌সেন পড়া উচিত; অনেক সময়

তাঁর লেখা পড়া কষ্টকর বটে তবু তাঁর মধ্যে অনেক কিছু শিখবার আছে।

একদিন যখন শুনলেন আমি একখানা ফরাসী লেখকের উপন্যাস পড়ছি, টল্‌স্‌টয় বিরক্ত হয়ে বল্লেন, বাজে নভেল। ফরাসীদের মধ্যে তিনজন মাত্র সত্যিকারের লেখক আছেন—ষ্টেন্‌ঢাল, ব্যালজাক ও ফ্লবার্ট। মোপাশাঁকেও ভাল বলা যেতে পারে কিন্তু শেখভ তাঁর চেয়ে ঢের বড়। গনকোর্ট ভাঁড় বিশেষ, তাঁর লেখাতে আন্তরিকতা নেই, কেবল বাগাড়ম্বরে পূর্ণ। মানুষের সম্বন্ধে তাঁর যে অভিজ্ঞতা তা কেবল বই-পড়ে পাওয়া—সে বইও আবার তেমনি বাগাড়ম্বরে ভরা, সে জন্য তাঁর লেখা মানুষের মনকে স্পর্শ করে না।

আমি এ কথার প্রতিবাদ করলুম বলে তিনি বিরক্ত হলেন। তিনি তাঁর মতামতের প্রতিবাদ সইতে পারতেন না। এক এক সময় তাঁর মত ও ধারণা আমাদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হত।

একদিন আমার গল্প সম্বন্ধে বললেন, আমার লেখার মধ্যে না কি বেশী বাড়াবাড়ি আছে। কিন্তু Dead Soul-এর কথা উঠতেই তিনি হেসে বলে উঠলেন, আমরা সকলেই স্বাভাবিকতার উপর ওস্তাদি খাটাতে মজবুদ। লিখতে বসে কাউকে কুশ্রী কদর্য্য করতে গিয়ে আমার নিজেরই তার উপর কেমন মায়া বসে যায়, তখন তার মধ্যে কিছুটা ভালোর আমেজ প্রক্ষেপ করে দিই বা তার পারিপার্শ্বিক কোন চরিত্র থেকে খানিকটা সৎগুণ কেড়ে নিই, তখন আর তাকে তত বীভৎস কুৎসিত বলে মনে হয় না। খানিকটা থেমেই আবার নির্ম্মম বিচারকের কঠোর স্বরে বলে উঠলেন, সেই কারণেই আমি বলি যে, আর্ট মিথ্যে, মানুষের আপনার তৈরী প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়, কাজেই তা মানুষের কোন উপকারেই আসে না। যা সত্যি, যা স্বাভাবিক, আমরা তা লিখি নে, ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে আমাদের যা নিজের ধারণা, তাই আমরা লিখি। আমার চোখ দিয়ে জগৎ ও তার সৃষ্টিবৈচিত্র্য দেখে তোমার কি লাভ?

একদিন তাঁর সঙ্গে আমি রাস্তায় বেড়াতে বার হয়েছিলাম। এক জায়গায় এসে তিনি কতকটা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, আত্মার অনুসরণ করে চলাই আমাদের উচিত। কিন্তু আসলে আমরা কি ভাবে জীবন যাপন করি? দেহই যেন আমাদের মনিব, আত্মা যেন তার ভৃত্য।

হঠাৎ তাঁর যেন কি কথা মনে পড়ে গেল, বুকে জোরে জোরে হাত ঘসতে ঘসতে বলতে লাগলেন, একবার মস্কোতে এক স্ত্রীলোককে আমি নর্দ্দমায় পড়ে থাকতে দেখেছিলুম। এত অতিরিক্ত মদ খেয়ে ছিল যে, তার নড়বার চড়বার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পেয়ে গিয়েছিল। তার পিঠ ও ঘাড় নর্দ্দমার উপর পড়ে আছে, আর নীচে দিয়ে যত রাজ্যের পচা নোংরা জল বয়ে যাচ্ছে। শীতে হিমে সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, হাত-পা এ-পাশে ও-পাশে ছুঁড়ছে, এক একবার একরকম অস্পষ্ট গোঁ গোঁ শব্দ করছে।

বলতে বলতে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল, চোখ বুঁজে এল। খানিকক্ষণ এ ভাবে কেটে গেল, তারপর আমার দিকে চেয়ে আবার বলে উঠলেন, এস, এখানে একটু বসি। . . . স্ত্রীলোক মাতাল হলে কি কুশ্রী, বীভৎস যে হয় তা আর বলবার নয়। . . . তাকে ধরে তুলতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু পারি নি। এমনি কুৎসিত তাকে দেখাচ্ছিল! আমার কেবলি মনে হচ্ছিল যে, তাকে ছুঁলে আমার হাতের ময়লা যাবে না। সামনেই রাস্তার মোড়ে একটা ছোট্ট ছেলে বসে ছিল, চোখ দিয়ে তার জল ঝরে পড়ছে। বেচারা কাঁদতে কাঁদতে স্ত্রীলোকটার গায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে বলছে, মা, ওমা, ওঠ্। স্ত্রীলোকটা হাত-পা নাড়ছে, গোঁ গোঁ করছে, এক একবার চোখ মেলে উঠবার জন্যে চেষ্টা করছে, কিন্তু তখনই আবার কাৎ হয়ে নর্দ্দমায় পড়ে যাচ্ছে।

তিনি চুপ করলেন। খানিকক্ষণ স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় একবার চারিদিকে তাকিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন, কি বিশ্রী, কি ভয়ানক! তুমি ত অনেক মাতাল স্ত্রীলোক দেখেছ, কেমন, না? তাদের সম্বন্ধে কখনো লিখো না, কখনো না, কখনো না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন বলুন ত?

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বল্লেন, কেন? সঙ্গে সঙ্গেই আবার চিন্তায় ডুবে গেলেন, সে অবস্থাতেই ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, কেন? তা বলতে পারি নে। কথাটা হয় ত হঠাৎ মুখ দিয়ে বার হয়ে পড়েছে। এমন বিশ্রী বিষয়ে না লেখাই ভালো।... তাই বা কেন, সবই লিখতে হবে—না, না, কিছুই বাদ দিয়ো না।

বলতে বলতেই তিনি কেঁদে ফেললেন। চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি রুমাল দিয়ে একবার চোখ মুছে নিলেন। একবার আমার পানে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। আবার তখনই তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা বয়ে গেল। তিনি ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, আমি নাকি বৃদ্ধ হয়েছি, তাই কুৎসিত দৃশ্যের কথা মনে এলেই কান্না আসে।

আস্তে আস্তে আমার কাঁধে হাত রেখে বল্লেন, তোমারও একদিন কাঁদতে হবে। আমার চাইতে বেশী দেখেছ তুমি, বেশী সয়েছ। কিছু বাদ দিয়ো না—সব লিখো। তা না হলে ওই ছেলেটির প্রতি অবিচার করা হবে, সে আমাদের অভিশাপ দিয়ে বলবে,—মিথ্যে, মিথ্যে, তোমাদের সবই এক বিরাট মিথ্যে।—তার কাছে সত্য হওয়া চাই ত।

তাঁর স্বর কোমল হয়ে এল। গভীর স্নেহে আমায় বললেন, ছাখো, একটা গল্প বল। তুমি বেশ গল্প বলতে পার। তোমার ছেলেবেলার গল্প। আমার কিছুতেই মনে হয় না যে, এক সময়ে তুমি শিশু ছিলে। তোমার মধ্যে কি যেন একটা আছে। আমার কেবলই যেন মনে হয়, তুমি এমনই বড় হয়েই জন্মেছ। তোমার চিন্তা, তোমার ভাবরাশি এখনো অনেকটা অপরিণত রয়ে গেছে, তোমার শৈশব এখনো যেন নিঃশেষ হয়ে যায় নি, কিন্তু তবু জ্ঞান অনেক—এর চাইতে বেশী কিছু আমরা কারুর কাছে আশা করতে পারি নে। তোমার নিজের জীবনের গল্প বল আমায়।

তিনি একটা গাছের শিকড়ের উপর বসে পড়লেন। ঘাসের উপর কতকগুলি পিপঁড়ে চলা ফেরা করছিল, তাদের মনোযোগের সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

হঠাৎ যেন তিনি আমায় তীব্র প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করলেন, আচ্ছা আইভান, তোমার কেন ভগবানে বিশ্বাস নেই?

আমি যে নাস্তিক।

না, না, কখনো না। তুমি ত কখনো নাস্তিক হতেই পার না। তোমার স্বভাবই তা নয়। ভগবানের কাছ থেকে কিছুতেই দূরে যেতে পারবে না। তোমায় একদিন তাঁর কাছে আসতেই হবে। জোর করে তুমি নিজেকে নাস্তিক বলে মনে করছ, কারণ তোমায় ঢের সইতে হয়েছে। এটা ভেবো না যে, ছুনিয়াটা তোমার ইচ্ছাতেই চলবে। অনেকে বাহাছুরি নেবার জন্যে সঙ্গে নিজেকে নাস্তিক বলে মনে করে। বয়স যাদের কম, তারাই দেখা যায় এ রকমটা মনে করে। কোন মেয়েকে তারা হয় ত ভালোবাসে, কিন্তু তা প্রকাশ করতে চায় না, ভয়ও করে, আবার মনে করে সে হয় ত তার ভালবাসার দাম জানে না। বিশ্বাসীরও প্রেমিকের মত নির্ভীক সাহসী হওয়া চাই। একবার সাহসের সঙ্গে বলতে হবে, বিশ্বাস করি। অমনই দ্বিধা সঙ্কোচ সব দূর হয়ে যাবে। ভালবাসা তোমার মধ্যে প্রচুর আছে। ভালবাসার উঁচু আদর্শই হচ্ছে বিশ্বাস। তোমায় আরো ভালবাসতে হবে, তাহলেই তোমার ভালবাসা বিশ্বাসে পরিণত হবে। যখন কোন মেয়েকে ভালবাসা যায় তখন ছুনিয়ায় তার চাইতে কেউ শ্রেষ্ঠ আছে বলে মনে হয় না—তার জুড়ি যেন আর কেউ নেই। একেই বলে বিশ্বাস। যার বিশ্বাস নেই, সে কখনো ভালোবাসতে পারে না। সে আজ একজনকে আবার কালই আর একজনকে ভালোবাসে। তার আত্মা ভবঘুরের মত শূন্য শুষ্ক ও নীরস। তুমি ত কিছুতেই এ রকমটা হতে পার না, তুমি বিশ্বাসী হয়েই জন্মেছ। মিথ্যে দিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখা তোমার বৃথা। তুমি হয় ত সৌন্দর্য্যের ওজুহাত দেখাবে। কিন্তু সৌন্দর্য্য কি? ভগবানের চাইতে সুন্দর আর কি আছে?

আগে কখনো এ সব কথা তিনি আমায় এমন করে বলেন নি। খানিকক্ষণের জন্য তাঁর সম্মুখে আমি কেমন

যেন অভিভূতের মত হয়ে পড়লাম। তিনি আমার মুখের দিকে একবার তাকালেন—তাঁর মুখে চোখে তখন দীপ্ত উজ্জ্বল হাসি।

কেন জানি নে, অবিশ্বাসী আমি, ভীত চকিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। অমনি আমার অন্তরাত্মা বলে উঠল, এ ব্যক্তি ভগবানেরই প্রতিচ্ছবি।

গান

শ্রীকল্যাণী ঘোষ

("আর আমাদের সাহেব হবার বাকি কি"—সুরে)

আর আমাদের জেগে ওঠার বাকি কি ?
(আমরা) দরজা এঁটে ঘরের কোণে
সাহেবগুলোয় গালি দি'!

নারী-নির্য্যাতন হ'লে,
সভায় ভাসি নয়ন-জলে,
পত্নী যদি বলেন ঘরে,
'আনো তারে' বলি 'ছিঃ।'

ছেলে বল্‌লে 'নোবো না পণ',
আমরা রেগে আগুন তখন,
মেয়ে বল্‌লে 'চরকা কাটি'
আমরা বলি—'গুখুরি!'

ভিক্ষা দিই না আতুরেরে
তেড়ে বলি—'খাও গে করে'
বন্যায় দিয়ে একটি টাকা
'দৈনিকে'তে নাম ছাপি!

(যখন) দেশ বলিয়ে থাক্‌বে না আর,
(তখন) আমরা করবো দেশোদ্ধার,
(এখন) মরার আগেই সমারোহে
আপন মায়ের পিণ্ড দি'!
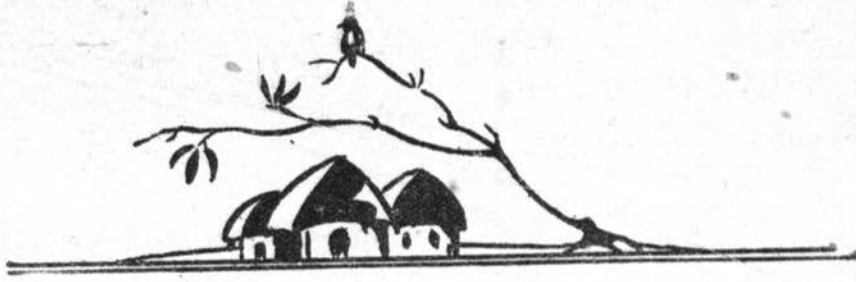
মৃত্যুর অমৃত

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

নতুন ডাক্তার।

নামের শেষে ইংরেজী বর্ণমালার প্রায় অর্দ্ধেকগুলা খেতাব হিসাবে জুড়িয়া দেওয়া! পসার-প্রতিপত্তির অন্ত নাই, প্রবীণ দলের মনের জ্বালা বৃদ্ধি করিয়া সে জিনিষটী প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

নববধূ সুলেখা যেন শিল্পীর প্রতিমা। সে তার গোলাপ পাতার মত ঠোঁট দুটী ফুলাইয়া বলে, বাবা, কাজ আর কাজ! মানুষের একটু কি ছুটী থাকতে নেই!

যতীন বলে, থাকবে কোত্থেকে! চীকিৎসা-শাস্ত্রের সঙ্গে আরাম জিনিষটার প্রায় বৈমাত্রেয় সম্পর্ক। তোমার চোখে আট্‌কা থাকতে গেলে রুগী বেচারা—

সুলেখার চোখের কালো তারা দুটী ছল ছল করে; বলে, তা বেশ ত—তবে আমায় আর বে' করা কেন! রুগীদের কাউকে—

যতীন 'টাই'টা ঠিক করিতে করিতে বলে, একেবারে অতদূর নয়।... ডাক্তার যখন রুগী দেখতে বাড়ী ঢোকে তখন তাকে জামাই করবার কথা কারো মনেই হয় না! ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ত ভয়ে সরে দাঁড়ায়, ভাবে যত বড় বড় রোগ—ঘা-ফোঁড়া—সব ডাক্তারের দু' পকেট ভরা! আর যাঁরা একটু বয়সে বড়, তাঁরা ভাবেন ডাক্তার ত' যমের প্রতিদ্বন্দ্বী—তার সঙ্গে আর যাই হোক—

সুলেখা পরাজয়ের আনন্দে হাসিয়া বলে, কথার জাহাজ! বাবা গো—কেউ যদি পারে! ... কিন্তু, আমাদের এই পাশের বাড়ীর বউটীকে দেখি সব সময় স্বামীর সঙ্গে বসে কেমন গল্প করচে। তবু তার স্বামীর বয়স হয়েছে ঢের। তাদের কত ভাব—

যতীন হাসিয়া প্রশ্ন করে, বটে! আর আমাদের বুঝি যত আড়ি?

আমি কি তাই বল্‌চি,—চোখ ঘুরাইয়া সুলেখা বলে। ভারি সুন্দর বউটী। ... আমার চেয়ে..., হাসি নয়, সত্যি গো সত্যি—আমার চেয়ে! কেমন সেলায়ের কাজ করে ওই জানলায় বসে, আর সন্ধ্যে হলে কেমন গান করে—

যতীন মনে করে, সুলেখা বুঝি তাহাই চায়, তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করে, তোমাকেও একটা বাজনা এনে দেবো, তুমি শিখ্‌বে?

সুলেখা হাসিয়া উত্তর দেয়। দূর—তাই বুঝি! সবাই কি তা পারে? কেউ বাজায়, কেউ বা শোনে।

—তোমার তবে শোনার পালা, কেমন?—বলিয়া নীচে নামিয়া যায়। সুলেখা ছুটিয়া যায় জানালায়, মোটরটা আর দেখা যায় না।

সুলেখা বলে, একটা দিন যাবে ওদের বাড়ী — ভারি শক্ত অসুখ—

কার?

বউটীর স্বামীর। ভয়ে তোমায় ডাকে না—গরীব মানুষ, পয়সা ত'—

সে রাত্রে ডাক্তার পাশের বাড়ী যায়। ফিরিয়া বলে, ওগো, তোমার সইকে জিজ্ঞেস করো ত'—সে বোধ হয় আমাকে জানে।

সুলেখা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞেস করে, সে আবার কি! ওরা এসে পর্য্যন্ত তোমায় ত'—

যতীন বলে, না সে জানা-জানি ওদের এখানে আসার অনেক আগেকার। জিজ্ঞেস করো মনে করে।

ব্যস্ত শহরের উন্নত মাথা সৌধগুলির আড়ালে সন্ধ্যা-সূর্য্য অস্ত যায়। অন্ধকার আকাশে তারার দল একটীর পর একটী ফুটিয়া উঠে। সারাদিনের কাজ শেষ করিয়া পাশের বাড়ীর বউটী আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়ায়। সুলেখাও হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসে। সংসারের প্রত্যেক কথাটী দু'জন দু'জনকে জানায়। তার পর সুলেখা প্রশ্ন করে, কাল ত' উনি তোমাদের ওখানে গিয়েছিলেন। চিনতে পারলে?

রেবা চোখ বন্ধ করিয়া ভাবে। মনের মধ্যে দশ বৎসরের স্মৃতি টানিয়া আনিয়া জড়ো করে, একটীর পর একটী। সেই স্মৃতি-স্তূপের মধ্যে চোখ ছুটিয়া যায় ঘটনার কঙ্কালগুলির উপর। বলে, কি জানি। তাঁকেই জিজ্ঞেস করো।

সুলেখা ঝরণার জলের মত হাসিয়া বলে, উনিই ত' তোমায় জিজ্ঞেস করলেন।

রেবার অন্তরে পুলকের সাড়া জাগে—সুখের উপর তৃপ্তির আলো ভাসিয়া উঠে। হঠাৎ উদাস সুরে বলে, তা হলে এখনো মনে আছে বলো?

সুলেখার হাসি অকারণে বাধা পায়। আর কোন কথা হয় না।

যতীন আহারে বসিলে সামনে আসিয়া সুলেখা জিজ্ঞাসা করে, হ্যাগা, ও কে?

ডাক্তার উত্তর দেয়, ছেলেবয়সের খেলুনী, তোমার যেমন অনেক ছিল, তেমনি আমারও অনেকের ও' একটী।

সুলেখা গম্ভীর মুখে, ততোধিক গম্ভীর সুরে প্রশ্ন করে, খুব ভাব ছিল বুঝি তোমাদের?

—তার চেয়ে বেশী ছিল তার অভাবটা। আর, ও' ছিল একের নম্বর দুষ্টু! আজকের রেবাকে দেখলে সেদিনের তাকে মিথ্যে বলেই মনে হয়। সত্যি, বিয়ে হলেই তোমরা এমনি বদলে যাও!

সুলেখা জড়িত কণ্ঠে বলে, তুমি বুঝি ওকে খুব ভাল বাসতে?

যতীন দুষ্টুমী করিয়া বলে, হিংসে হচ্চে বুঝি? সত্যি, না। আর যদিই বা ভালবাসতুম—তার জন্যে আজকে আর ভয় করবার কিছু থাকৃত না। সে ভালবাসা লম্বা দশ বছরের ছুড়োছুড়ির চাপে দম আটুকে মরে থাকতো। আর হিংসে করেই বা করবে কি? ও ত' পরের বউ, কোমর বেঁধে ঝগড়া করতেও ত' পারবে না। সতীন হলেও না হয়—

সুলেখার মুখের হাসি চোখের জলে ঝাপ্‌সা হইয়া যায়। বলে, আমি ত' ঝগড়া করবো বলি নি। বরং পার ত' নিজে গিয়ে ওর স্বামীর সঙ্গে লড়ে এসো—তোমার জিনিষটী বে-দখল করে নিয়েচে বলে'।

তারপর বিছানায় উপুড় হইয়া কান্নার বান ডাকায়।

যতীন অপ্রস্তুত হইয়া বলে, কী মুশকিল! নিজেই ত'

বলে' বলে' ওদের বাড়ী পাঠালে! আমি কি নিজে যেতে চেয়েছিলুম? একদিন চেনাশুনো ছিল—এ কথা বলায় রাগ কেন হ'বে তাও বুঝি না! ও আমার দেশের মেয়ে—

যতীনের অত দীর্ঘ কৈফিয়তেও স্থলেখার অভিমান ভাঙে না। . . . মনের জঞ্জাল বাড়িয়াই চলে।

রেবা মাঝে মাঝে জানালার ধারে নিষ্ফল প্রতীক্ষায় আসে। রহিয়া চলিয়া যায় . . . কেহ আসে না।

—

পাশের বাড়ীর রুগীটার অবস্থা দিন দিন খারাপ হইয়া আসিয়াছে। ডাক্তার মধ্যে মধ্যে ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা দিয়া আসে।

রেবা জিজ্ঞাসা করে, বউকে জানলায় আসতে বারণ করেচো বুঝি?

যতীন হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলে, বউটাও মেয়েমানুষ, তুমিও তাই—বারণ করতে যাব কেন?

রেবা তা'র স্বামীর গায়ে শালটা মুড়ি দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করে, তবে বুঝি বউয়ের আমাকে ভয়?

তা হ'বে—যতীন উত্তর দেয়।

রুগ্ন স্বামী ঘুমায়। তাহার প্রতি চাহিয়া রেবা বলে, কিন্তু তোমার কথার খুব ঠিক্। সাত সাগর পাড়িই যদি দেবে মনে ছিল, বাবার কাছে তবে স্বীকার করেছিলে কেন? . . . জান ত বাঙালীর মেয়ে, তাতে গাঁয়ের মেয়ে—তোমার আমেরিকার মেয়েদের মত ত্রিশ বছর অপেক্ষায় বসে থাকতে পারে না!

ডাক্তার কালোমুখে বলে, খেয়ালের ঝোঁকে—বিলেত দেখার নেশায় পালিয়েছিলুম, তোমায় বিয়ে করবার ভয়ে পালাই নি। বিশ্বাস করো—

অবিশ্বাস আমি কোনো দিন করি নি—করবোও না। তবে তোমায় বিশ্বাস করে কি পেয়েছি তা ত' তুমি দেখ্‌চ! তোমার বিরুদ্ধে আমার একটা অভিযোগও নেই।

যতীন শুষ্কস্বরে বলিয়া যায়, আর, তোমায় হয় ত' আমি ঠিক ভালও বাসি নি রেবা। ছেলে বয়েসের ভাব আর ভালবাসাকে যাঁরা এক ভাবেন—এ অভিযোগ তুমি তাঁদের বিপক্ষেই করো। আমাদের বাপ-মা ভেবেছিলেন—আমাদের হুজনের মিলনে সুখী হ'ব। তখন হয় ত অসুখী হতুম না, কিন্তু আমি তোমায় বরাবর অন্যভাবে দেখে-ছিলুম রেবা।

দংশনাহত পাণ্ডুর মুখে রেবা উত্তর দেয়, তবে তুমি নির্দ্দোষ . . . নিষ্কলঙ্ক! যত দোষ আমাদের বাপ-মা'র—আমার কিন্তু . . . বলতে পারো ডাক্তার, যাকে পাবো না—পাওয়া যাবে না—তাকে চোখের সামনে এনে ভগবান সেই দুর্ল্লভের লোভ এমনি করে বাড়িয়ে দেন কেন? আমাদের ছেলেবয়েসটাকে যদি আমার জীবনের পাতা থেকে মুছে দিতে পারতুম।

যতীন উঠিয়া পড়ে, বলে, সে কথা থাক্। আলেয়ার পিছনে ছুটো না। একটা জীবন মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেচে—তার গতি তোমাকেই ফেরাতে হবে। যে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় তাকে ফিরে বার চোখ বন্ধ করে ফিরিয়ে আনা যায় না—সে চেষ্টা করো না।

রোগী হঠাৎ চোখ মেলিয়া চায়, ডাক্তারের কঠিন হাত দুটো আপনার হাড়-বাহির-করা কাঁপা হাতে ধরিয়া বলে, সব শুনলুম—

ডাক্তার আর রেবা সমান তালে কাঁপিয়া উঠে।

রোগী তেমনি স্বরে বলে, কিন্তু অপরাধ ত আমার নয়—দেশের, জাতের। বিয়ের আগে ওর মনের খবর আমি পাই নি। তাই এই দীর্ঘদিন আলেয়ার পিছনে ছুটে বেড়াল ও'। . . . এ বয়সে বিয়ে যে আমি স্বেচ্ছায় করি নি—এটা অনেকেই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এই দীর্ঘজীবনটাই যার মিথ্যা হয়ে গেল—সে যে আর নতুন করে মিথ্যা বলবে না—এটা হয় ত তুমি বুঝতে পারবে। ও' পারে কি না—বলতে পারি না। বুড়ো মা'র জেদে পড়ে বিয়ে করেছিলুম। বুঝলুম ভুল হয়েচে, মস্ত ভুল। শোধরাবার উপায় ছিল না—এমনি ভুল। তাই ক্ষমা পাবার চেষ্টাই করেচি—ওর বাইরের সাধ পূর্ণ করতে কখনো দেরী করি নি। তাতে ওর তৃপ্তি হয় নি, হওয়াও অসম্ভব। আমার নিজের ত কিছু ছিল না—যা দিয়ে ওকে সুখী করতে পারতুম। তার জন্যে আজ আর দুঃখ

করব না। ও তোমার সন্ধান পেয়েচে—এইটুকু আমায় পৃথিবী ছেড়ে যাবার কালে সান্ত্বনা হয়ে থাকবে। শেষ ক'টা দিন ওর সুখেই কাটবে। তুমি তাকে নিজের ঘরে একটু স্থান দিও—ও' হয় ত তাতেই সুখী হ'বে। ডাক্তার—আমিও তাতে সুখী হ'ব। কারণ জানবো, যে-সুখ আমি জীবনে তা'কে দিতে পারি নি—জীবনের পরপারে এসে সে সুখ তাকে দিয়েচি। ডাক্তার, ও' তোমায় দেখ্‌তে পাবে, সুখী হ'বে।

রেবা আনত মস্তকে পরপার-যাত্রী স্বামীর পায়ে মাথা ঠেকায়।

দিন যায়।

আর একদিন।

ডাক্তার ব্যস্তভাবে রোগী পরীক্ষা করে। মুখে কথা আসে না। রেবার আর্ত্ত চীৎকারে ছোট্ট বাড়ীখানি ভয়ে শিহরিয়া উঠে।

যতীন সুলেখাকে জিজ্ঞাসা করে, রেবাকে বড় বাড়ীতে ঢোকালে ?—ভয় হ'ল না !

সুলেখা হাসিয়া উত্তর দেয়, না। ও যে তার সব ভয়ের জিনিষ সে দিন চিতার আগুনে পুড়িয়ে এসেচে। ও যে বিধবা। আর ওর স্বামী যে বিশ্বাসে ওকে তোমার হাতে দিয়ে গেছে—তার বেশী এগোতে সে পারবে না। আমি সব শুনেচি গো—সব। সেই ক্ষয়-ধরা স্বামী—শেষের দিনে তার প্রাণের সন্ধান দিয়ে রেবার বুকে নিজেকে অক্ষয় করে গেছে !

ওরে সোনার পাখী

[চব্বিশ পরগণার গ্রাম্য চাষীদের ভাষা]

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

পেইলে গেলি, অইলি নাক
ওরে আমার পাখী !
শূন্‌ন্যি আমার বুকির খ্যাঁচা
কাঁদ্‌চে থাকি' থাকি' !
ক্ষ্যাতের কাজে মন নাগে না,
ঘরেও যাতি হুপ্ চাগে না,
পিরৃথিমীটা কেবল যেন
নিম্পু দেখি ফাঁকি !
ওরে সোনার পাখী !

পঁইছে-খাড়ু অইল তোলা
ঘরের কোলঙ্গাতে !
বাজ্‌বে না আর পায়ের ঝাঝর্
আমার উঠোন্‌টাতে !
সন্ধ্যেবেলার অন্দোকারে
কাঁদি বোসে দাবার ধারে
নতুন-কেনা নাল সাড়ী তোর
কোলের ওপর চাপি' !
ওরে সোনার পাখী !

দিব্যি কোরে বল্‌তে পারি
পিদ্দীমে ত্যাল্ ছ্যালো,
তবু বাতাস নিইবে দিলে
ভাঙা-কুঁড়ের আলো !
কাজের নেয়ে যায় বেয়ে 'না'
মনের তোলায় ঢেউ নাগে না ;
বুকির বেতায় পরাণ উদাস
কোন্ ছলে বা ঢাকি !
ওরে সোনার পাখী !

শব্দ-পরিচয় :—পাখী শব্দটা হল আদরের ডাক্। পেইলি = পালিয়ে, অইলি = রহিলি, শূন্‌ন্যি = শূন্য, বুকির = বুকের, খ্যাঁচা = পিঞ্জর, ক্ষ্যাতের = ক্ষেত্রের, নাগে = লাগে, খাতি = খাইতে, হুপ্ = উৎসাহ, নিম্পু = শুধুই, পঁইছে, খাড়ু এবং ঝাঁঝর = অলঙ্কার বিশেষ, অইল = রইল, পিরৃথিমী = পৃথিবী, অন্দোকারে = অন্ধকারে, নাল = লাল, বল্‌তি = বলিতে, পিদ্দীমে = প্রদীপে, ত্যাল্ = তৈল, ছ্যালো = ছিল, নিইবে = নিবিয়ে, তোলায় = তলায়, বেতায় = ব্যথায়।

অভিভাষণ

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

[লাহোরে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণের সারমর্ম।]

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সম্মিলনের সভাপতিহিসাবে আমার নিকট হইতে আপনারা আশা করিতে পারেন যে, আমার ত্রিশ বৎসরের অনুসন্ধানের ফলের একটা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা আমি দিব।

আমার অনুসন্ধানের ফলে আমি এই মহান্ সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছি যে, সমস্ত প্রকার প্রাণ-ক্রিয়া একই প্রকার। এই সিদ্ধান্ত হইতেই অনুসিদ্ধান্ত করা যায় যে, মানুষের সমস্ত চেষ্টার মধ্যেও একটা ঐক্য নিশ্চয়ই আছে—মনোরাজ্যে কোথাও সীমা রেখা নাই, কোথাও পার্থক্য নাই। সংঘর্ষকে অভিব্যক্তির একমাত্র কারণ ধরিয়া লওয়া—প্রাকৃতিক নিয়মকে ভুল বুঝা। সংঘর্ষের ফলে নহে, বরং পারস্পরিক সাহায্য এবং সহানুভূতির ফলেই প্রাণী প্রাণধারণ করিয়া থাকে।

জগৎ জ্ঞানের উন্নতির জন্য অন্য কোন একটি জাতি বিশেষের নিকট ঋণী—এ কথার মত অসত্য এবং অজ্ঞতার পরিচায়ক আর কিছু নাই। সমগ্র জগন্মণ্ডল পরস্পর নির্ভরশীল। যুগযুগান্ত ধরিয়া একটা অনাহত চিন্তাধারা মানবজাতির যৌথ সম্পত্তিকে সমৃদ্ধশালী করিয়া আসিয়াছে। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার অনুভূতিই বিশাল মানবজাতিকে এক সূত্রে গ্রথিত রাখিয়াছে এবং সভ্যতার স্থায়িত্ব ও ধারা বজায় রাখিয়াছে।

এই দেশেই একদিন যবন ও আর্য্যগণ, পরস্পরের মধ্যে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তাহার আদান প্রদানের জন্য তক্ষশিলায় সমবেত হইয়াছিল। আবার বহু শতাব্দী পর এখানে প্রাচী ও প্রতীচীর মিলন হইলেই উভয়ের সভ্যতার মহত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন প্রথম অনুসন্ধান আরম্ভ করি, তখন একটা সাধারণ ধারণা ছিল যে, ভারতের মানসিক বৈশিষ্ট্যের ফলে ভারত চিরকালই জড়বিজ্ঞানের অনুসন্ধান উপেক্ষা করিয়া মনোবিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি দিবে। সকলেই ভারতবর্ষকে ইন্দ্রজাল এবং রহস্যবাদীর দেশ বলিয়া মনে করিত। বহু বর্ষের চেষ্টার ফলে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়াছে। আজ সৌভাগ্যক্রমে আমি দেখিতেছি যে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশই জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কিছু না কিছু দান করিতেছে। এই বিজ্ঞান মহাসভার কার্য্যাবলীই তাহার প্রমাণ।

ভারতের দানের শক্তি

বিজ্ঞানানুশীলন একমাত্র প্রাচীরও বৈশিষ্ট্য নহে, ইহা সার্ব্বভৌমিক এবং আন্তর্জাতিক। তথাপি এ কথা বলিতে পারা যায় যে, ভারতবাসী মানসিক গতি এবং বংশপরম্পরাপ্রাপ্ত মহৎ গুণাবলীর ফলস্বরূপ মানবজাতির জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে বিশেষ সমর্থ।

কোনপ্রকার বড় আবিষ্কারের জন্য জীবন্ত কল্পনা, পরিষ্কার অন্তর্দৃষ্টি, উদ্ভাবনীশক্তি এবং প্রয়োগ-নিপুণতার বিশেষ আবশ্যক। উদ্ভিদের অভ্যন্তরের জীবনী-ক্রিয়া জানিতে হইলে অনুসন্ধিৎসুকে নিজে বৃক্ষস্বরূপ হইতে

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

অভিভাষণ

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

[লাহোরে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণের সারমর্ম্ম।]

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সম্মিলনের সভাপতিহিসাবে আমার নিকট হইতে আপনারা আশা করিতে পারেন যে, আমার ত্রিশ বৎসরের অনুসন্ধানের ফলের একটা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা আমি দিব।

আমার অনুসন্ধানের ফলে আমি এই মহান্ সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছি যে, সমস্ত প্রকার প্রাণ-ক্রিয়া একই প্রকার। এই সিদ্ধান্ত হইতেই অনুসিদ্ধান্ত করা যায় যে, মানুষের সমস্ত চেষ্টার মধ্যেও একটা ঐক্য নিশ্চয়ই আছে—মনোরাজ্যে কোথাও সীমা রেখা নাই, কোথাও পার্থক্য নাই। সংঘর্ষকে অভিব্যক্তির একমাত্র কারণ ধরিয়া লওয়া—প্রাকৃতিক নিয়মকে ভুল বুঝা। সংঘর্ষের ফলে নহে, বরং পারস্পরিক সাহায্য এবং সহানুভূতির ফলেই প্রাণী প্রাণধারণ করিয়া থাকে।

জগৎ জ্ঞানের উন্নতির জন্য অন্য কোন একটি জাতি বিশেষের নিকট ঋণী—এ কথার মত অসত্য এবং অজ্ঞতার পরিচায়ক আর কিছু নাই। সমগ্র জগন্মণ্ডল পরস্পর নির্ভরশীল। যুগযুগান্ত ধরিয়া একটা অনাহত চিন্তাধারা মানবজাতির যৌথ সম্পত্তিকে সমৃদ্ধশালী করিয়া আসি-য়াছে। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার অনুভূতিই বিশাল মানবজাতিকে এক সূত্রে গ্রথিত রাখিয়াছে এবং সভ্যতার স্থায়িত্ব ও ধারা বজায় রাখিয়াছে।

এই দেশেই একদিন যবন ও আর্য্যগণ, পরস্পরের মধ্যে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তাহার আদান প্রদানের জন্য তক্ষশিলায় সমবেত হইয়াছিল। আবার বহু শতাব্দী পর এখানে প্রাচী ও প্রতীচীর মিলন হইলেই উভয়ের সভ্যতার মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন প্রথম অনুসন্ধান আরম্ভ করি, তখন একটা সাধারণ ধারণা ছিল যে, ভারতের মানসিক বৈশিষ্ট্যের ফলে ভারত চিরকালই জড়বিজ্ঞানের অনুসন্ধান উপেক্ষা করিয়া মনোবিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি দিবে। সকলেই ভারতবর্ষকে ইন্দ্রজাল এবং রহস্যবাদীর দেশ বলিয়া মনে করিত। বহু বর্ষের চেষ্টার ফলে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়াছে। আজ সৌভাগ্যক্রমে আমি দেখিতেছি যে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশই জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কিছু না কিছু দান করিতেছে। এই বিজ্ঞান মহাসভার কার্য্যাবলীই তাহার প্রমাণ।

ভারতের দানের শক্তি

বিজ্ঞানানুশীলন একমাত্র প্রাচীরও বৈশিষ্ট্য নহে, ইহা সার্ব্বভৌমিক এবং আন্তর্জাতিক। তথাপি এ কথা বলিতে পারা যায় যে, ভারতবাসী মানসিক গতি এবং বংশপরম্পরাপ্রাপ্ত মহৎ গুণাবলীর ফলস্বরূপ মানবজাতির জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে বিশেষ সমর্থ।

কোনপ্রকার বড় আবিষ্কারের জন্য জীবন্ত কল্পনা, পরিষ্কার অন্তর্দৃষ্টি, উদ্ভাবনীশক্তি এবং প্রয়োগ-নিপুণতার বিশেষ আবশ্যক। উদ্ভিদের অভ্যন্তরের জীবনী-ক্রিয়া জানিতে হইলে অনুসন্ধিৎসুকে নিজে বৃক্ষস্বরূপ হইতে

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

হইবে—তাহাকে উদ্ভিদের হৃদস্পন্দন নিজের মধ্যে অনুভব করিতে হইবে। এই অন্তর্দৃষ্টি মাঝে মাঝে বাহ্যিক পরীক্ষা দ্বারা মিলাইয়া দেখিতে হইবে, নচেৎ অবাধ কল্পনা আসিয়া জ্ঞানের পথরোধ করিয়া দিবে। এ কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভারতীয় কর্ম্মীরা সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, প্রয়োগকৌশল এবং উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়া প্রমাণ করিয়াছে যে, বিজ্ঞানে তাহাদের বিশেষ অধিকার আছে।

দেশের অশান্তি ও তাহার প্রতিকার

ইউরোপে যেমন ভারতেও তেমনি আর্থিক কষ্ট বর্ত্তমান অশান্তির কারণ; তবে ভারতের অশান্তির পরিমাণ অনেক বেশী, সুতরাং বিপদের আশঙ্কাও অধিক। আমার ভ্রমণকালে আমি দেখিয়াছি যে, নরওয়ে এবং ডেনমার্কে প্রকৃত পক্ষে কোথাও দারিদ্র্য নাই। বিজ্ঞানের মধ্য-দিয়া দেশের অর্থোৎপাদনের সমস্ত পথ খুলিয়া দেওয়াতেই এই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। ভারতবর্ষের মত একটা মহাদেশের আর্থিক কল্যাণের জন্য কৃষি এবং শিল্প, উভয় দিক দিয়াই পারম্পরিক সম্বন্ধযুক্ত চেষ্টা আবশ্যক। বারি-পাতের অনিশ্চয়তাবশত একমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করা চলে না। কিন্তু ভারতের খনিগর্ভে নিহিত বিপুল বিত্তরাশির উদ্ধার সাধন এবং শিল্পোন্নতির জন্য অনেক কাজ করা যাইতে পারে এবং তাহাতে অনেক সুফল লাভ হইতে পারে এবং তাহাতে অনেক সুফল লাভ হইতে পারে। প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহু যুবক বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, কিন্তু বাহিরে আসিয়া তাহারা কোন কর্ম্মক্ষেত্র পাইতেছে না। প্রকৃত রাজনীতিকের কার্য্য হইতেছে, এই অর্থনৈতিক সমস্যার বিপদ বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্বাহ্নেই সাবধান হওয়া, তাঁহাদের কর্ত্তব্য এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা, যাহাতে এই শিক্ষিত যুবকগণ এবং দেশের সুপ্ত ধনরাজি দেশের কল্যাণে আসিতে পারে। এই জন্য অবশ্য অনেক টাকার আবশ্যক। যদি ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধশালী করিবার জন্য এবং ভারতবাসীদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারের জন্য বিবেচনার সহিত ঐ টাকা ব্যয় করা হয়, তবে দেশবাসী ঐ টাকা দিতে নিশ্চয়ই প্রস্তুত আছে। বিপুল উদ্যোগের অনেক ক্ষেত্র রহিয়াছে, যেখানে ভারত-বাসী এবং ইংরেজ অংশীদাররূপে কাজ করিতে পারে।

উদ্ভিদের এবং জীবের প্রাণক্রিয়া

উদ্ভিদের প্রাণযন্ত্র আপাত দৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয় বলিয়া মনে হয়। পক্ষান্তরে প্রাণীর অস্থিরতা এবং সদা চলন-শীলতা হইতেই প্রাণক্রিয়া প্রতীয়মান হয়। এযাবৎকাল উভয়ের প্রাণক্রিয়ার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে বলিয়া মনে করা হইত। এই প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, উদ্ভিদের প্রাণক্রিয়া এবং জীবের প্রাণক্রিয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ইহা প্রমাণ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই একটা মহৎ সিদ্ধান্ত করা হয়। এই সিদ্ধান্ত করিতে পারিলে মানুষের প্রাণক্রিয়ার অনেক জটিল সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হইবে, কারণ বৃক্ষের মধ্যে অনুরূপ ক্রিয়া এবং সেই ক্রিয়ার ফলাফল জটিল সমস্যা সমাধান করা যাইবে। উভয় প্রকার প্রাণ-ক্রিয়ার মধ্যে ঐক্য স্থাপনের ফলে, শারীর-বিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের অনেক উন্নতি সম্ভব হইবে।

অদৃশ্য রাজ্যে

উদ্ভিদ জীবনের অনুসন্ধিৎসুর প্রধান অসুবিধা এই যে, উদ্ভিদের জীবনীক্রিয়া তাহার অভ্যন্তরের অন্তঃস্তরে মানবচক্ষুর অগোচরে সম্পন্ন হইয়া থাকে। উদ্ভিদের জটিল জীবনীক্রিয়া জানিতে হইলে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র প্রাণাংশ বা জীবাণুর সন্ধান এবং তাহার স্পন্দনের স্বরূপ জানিতে হয়। অনুবীক্ষণের দৃষ্টি যখন ব্যর্থ হয়, তখনো অদৃশ্যের সন্ধানে ছুটিতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই অদৃশ্যের সন্ধান না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বৃক্ষের জীবনীক্রিয়া রহস্যাবৃতই থাকিয়া যায়।

আমার বিজ্ঞান-মন্দিরে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র উদ্ভাবন দ্বারা এই বিঘ্ন অপসারিত হইয়াছে। আমার নূতন যন্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে, বৃক্ষের অভ্যন্তরের প্রাণক্রিয়া ঐ যন্ত্রে স্বতঃই প্রতিফলিত হয়। ফলে এযাবৎকাল পর্য্যন্ত যে

সমস্ত তথ্যের অনুসন্ধান সম্ভব ছিল না, সে সমস্ত তথ্যের সন্ধান সম্ভব হইয়াছে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও তাহাদের কার্য্য

জীবদেহের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এক একটি যন্ত্রস্বরূপ—প্রত্যেক যন্ত্রেরই এক একটি বিশেষ কাজ আছে। শারীর বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে আমরা প্রধানত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়ার সহিতই সংশ্লিষ্ট। তাহাদের গঠন-প্রণালীর সহিত নহে। ড্রসেরা নামক কীটভুক উদ্ভিদের পাতার মধ্যে কতকগুলি করিয়া শুঁয়া আছে, এই শুঁয়াগুলি একপ্রকার নির্য্যাস উদ্গীরণ করিতে থাকে। কীট-পতঙ্গাদি এই নির্য্যাসের মধ্যে আটকিয়া যায় এবং কাছাকাছি শুঁয়াগুলি বাঁকিয়া আসিয়া কীটকে আকড়িয়া ধরে। অতঃপর কীটটি সেই নির্য্যাসে দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং বৃক্ষটি তাহাকে হজম করিয়া ফেলে। এই প্রকাশ্য পাকস্থলী এবং প্রাণীর অভ্যন্তরস্থ অদৃশ্য জটিল পাকস্থলীর মধ্যে পার্থক্য কত বৃহৎ! ডাইওনিয়া নামক বৃক্ষের খোলা পত্রগুলির দুইটি অংশ মিলিয়া একটি ফাঁদ নির্ম্মিত হয়, মনে হয় যেন পোকা ধরিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া আছে। পোকা পাতার উপর পড়িলেই দুইটি অংশ মিলিয়া যায় এবং বৃক্ষ পোকাটিকে হজম করিয়া ফেলে। নেপেন্থি নামক উদ্ভিদের মধ্যে একটা থলিয়া মত জিনিষ আছে, এই থলিয়া কতকটা প্রাণীদেহের পাকস্থলীর অনুরূপ। অভিব্যক্তির ক্রমবিকাশ যে কেবল নূতন শরীর-গঠনের মধ্যেই দেখা যায় তাহা নহে, জীবন-ক্রিয়াসম্পাদক যন্ত্রগুলির মধ্যে এই ক্রমবিকাশ পরিলক্ষিত হয়। একটা সামান্য সরল অবয়ব কি ভাবে ধীরে ধীরে জটিল অবয়বে পরিণত হয়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার পক্ষে উদ্ভিদ-রাজ্য অতি চমৎকার ক্ষেত্র। আমি পরে প্রমাণ করিব যে, সর্ব্বপ্রকার জীবনক্রিয়া উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের জীবন ক্রিয়া—একই প্রকার।

প্রথম জীবনের সূত্রপাত

পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম জীবনের লক্ষণ কি ভাবে প্রকট হইল? পৃথিবী প্রথমে বায়ব পদার্থের সমষ্টিমাত্র ছিল, জীবন বলিতে বর্ত্তমানে আমরা যাহা বুঝি পৃথিবীর শৈশবে সেই জীবন সম্ভব ছিল না। আমার অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভূত মাত্রেরই চৈতন্য আছে এবং তাহার মধ্যে প্রাণশক্তি নিহিত আছে। এইরূপে সাধারণ জড় পদার্থ হইতে জটিল প্রাণীর সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে।

প্রাণীদেহে তিন প্রকার কোষ আছে—(১) পেশী-মণ্ডলীর সঙ্কোচন বিধায়ক, (২) হৃদস্পন্দন প্রভৃতি স্বতঃস্পন্দন বিধায়ক, (৩) স্নায়ু-মণ্ডলীর মধ্য দিয়া উদ্দীপনা সম্প্রবাহক।

পেশীমণ্ডলী

জীবদেহে পেশীমণ্ডলীর সঙ্কোচনের দ্রুততা, বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার। তিনটি বিশেষ উদাহরণ ধরা যাউক। শ্যেন প্রভৃতি শিকারী পাখীর পক্ষদ্বয়ের পেশীর সঙ্কোচন প্রসারণ অতি দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পাখীর এই শক্তি নাই বলিলেই চলে। এই পার্থক্যের কারণ কি? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উদ্ভিদরাজ্যেও এই পার্থক্য দৃষ্ট হয়। লজ্জাবতী লতার এই সঙ্কোচন চক্ষের নিমেষে সম্পন্ন হয়, কিন্তু কলমীলতায় সেইরূপ সঙ্কোচন মাত্রই দেখা যায় না। আমি সঙ্কোচনশীল কোষগুলিকে পৃথক করিতে সমর্থ হইয়াছি—জাফ্রাণ রং প্রয়োগ করিলে এগুলি গাঢ় রক্ত বর্ণ ধারণ করে। লজ্জাবতী লতায় এই ভাবে সঙ্কোচক কোষগুলিকে অন্যান্য কোষ হইতে পৃথক করা হয়, নিষ্ক্রিয় কোষগুলির রং-এর কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

উদ্ভিদদেহে জৈব জীবের মধ্যে এক প্রকার অতিরিক্ত জারকশক্তিবিশিষ্ট পদার্থের অস্তিত্বই এই দ্রুত সঙ্কোচন শক্তি দান করে। চমৎকার ব্যাপার এই যে, প্রাণীদেহের মধ্যেও এক প্রকার পদার্থের অস্তিত্ব বা অভাবে বিভিন্ন পেশী বিভিন্ন প্রকার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

প্রাণক্রিয়ার মধ্যে একটি বিষয় অতীব দুর্ব্বোধ্য—সেটি প্রাণীদেহে কতকগুলি অবয়বের, কোন প্রকার বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর না করিয়া স্বতঃস্পন্দন। সাধারণভাবে বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রকার গতির পশ্চাতেই একটা করিয়া

শক্তি আছে, কিন্তু স্বতঃস্পন্দমান হৃদযন্ত্র নাকি স্বেচ্ছাতেই স্পন্দিত হয় এবং এই জন্য হৃদ্‌যন্ত্রকে স্বয়ঞ্চল অঙ্গাংশ বলা হইয়া থাকে। এই স্বয়ঞ্চলনশীলতার রহস্য উদ্ঘাটন করা যায় কি করিয়া ?

এই যে স্বয়ঞ্চলনশীলতা ইহা অবশ্য সাধারণত জীব-দেহেই দেখা যায়, কিন্তু কোন কোন উদ্ভিদের মধ্যেও এই ব্যাপার দেখা যায়। বন চাড়ালের স্বতঃস্পন্দন এবং জীব দেহের হৃদ্‌স্পন্দনের মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে তাহা আমি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছি। বিষাক্ত এ্যাসিড প্রয়োগ করিলে সম্প্রসারণের সময় হৃদ্‌ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। পক্ষান্তরে ঔপক্ষারিক বিষ প্রয়োগে সঙ্কোচন কালে বন্ধ হয়। বননারেঙ্গার গাছের পাতাকে উত্তেজিত করিলে একবার মাত্র সাড়া পাওয়া যায়, কিন্তু উত্তেজনা যদি প্রবল হয় তবে বহুবার সাড়া পাওয়া যায়। প্রথম উত্তেজনার ফল জমা হইয়া থাকে, পরে তাহা প্রকাশ পায়। বাহির হইতে প্রাপ্ত উদ্দীপনা ক্রমশ জমা হইতে থাকে। ক্রমশঃ যখন খুব বেশী হইয়া যায় তখন বৃক্ষের মধ্যে স্বতঃই সঞ্চালন ক্রিয়া আরম্ভ হয়।

উদ্ভিদের পূর্ব্বেতিহাস সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাব বশতই আমরা মনে করিয়া লইতাম যে, বৃক্ষের এই সাড়া স্বতঃপ্রসূত। উদ্ভিদের অভ্যন্তরে যে উদ্দীপনা এই স্পন্দন সম্পাদন করে, তাহা বাহির হইতে প্রাপ্ত উদ্দীপনার সমবায় মাত্র। যে কোন স্বতঃসংজ্ঞ বৃক্ষকে সাধারণ বৃক্ষে রূপান্তরিত করা যায়। উদ্দীপনার আতিশয্যবশতই কোদালিয়া গাছ আপনা আপনি দুলিতে থাকে। এই গাছকে যদি অন্ধকারে রাখা যায় তবে ইহার শক্তির ভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়া যায় এবং ক্রমশ স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। পুনরায় শক্তি সংগৃহীত হইলে, পুনর্ব্বার-স্পন্দন আরম্ভ হয়। সামান্য উদ্দীপনায় সামান্য সাড়া পাওয়া যায়, কিন্তু উদ্দীপনা যদি বেশী হয় তবে অনেকবার সাড়া পাওয়া যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিয়া দিলে ধীরে ধীরে পূর্ব্বশক্তি সংগ্রহ করিয়া দুলিতে থাকে।

রক্ত ও উদ্ভিদরসের সঞ্চালন

উদ্ভিদদেহে কি করিয়া রসসঞ্চালন হয় তাহা বহুকাল যাবৎ জটিল রহস্যাবৃত ছিল। পর্য্যবেক্ষণের ফলে আমি প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি যে, কতকগুলি স্পন্দমান কোষের সাহায্যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে—এই কোষগুলি একই কালে হৃদযন্ত্র এবং স্নায়ুমণ্ডলীর কাজ করিয়া থাকে।

কেঁচো প্রভৃতি অস্ফুটদেহী প্রাণীর মধ্যে হৃদযন্ত্রটি একটি দীর্ঘাকৃতি অন্তরিন্দ্রিয়, ইহার সঙ্কোচন প্রসারণজাত তরঙ্গের সহায়ে পুষ্টিরসের সঞ্চালন হইয়া থাকে। স্ফুটদেহী প্রাণীর মধ্যেও হৃদযন্ত্রটি নলাকৃতি। আমি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছি যে, জীবদেহে হৃদযন্ত্রের সঙ্কোচন প্রসারণ দ্বারা যে ভাবে রক্ত সঞ্চালিত হয় উদ্ভিদদেহেও ঠিক সেই ভাবে রস সঞ্চালন হইয়া থাকে।

স্ফিগমোগ্রাফ যন্ত্র

কাণ্ড আশ্রয় করিয়া রসধারার আরোহণ কালে উদ্ভিদের নাড়ী স্পন্দন লক্ষ্য করিতে আমি সমর্থ হইয়াছি। প্রত্যেক স্পন্দনের সহিত বৃক্ষকাণ্ডের অতি সামান্য স্ফীতি লাভ হয়। স্পন্দন-তরঙ্গ প্রবাহিত হইবার পর বৃক্ষ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। Plant Ofeeler বা ptical Sphygmograph নামে আমি যে যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি, তাহার সহায়ে কোন সূক্ষ্ম জিনিষকে পাঁচ লক্ষ গুণ বড় করিয়া দেখা যায়। জীবন্ত উদ্ভিদের সামান্যাতিসামান্য নাড়ী স্পন্দন একটি আলোক রশ্মির দোদুল্যমান গতি হইতে বুঝিতে পারা যায়। অবসাদজনক ঔষধ প্রয়োগে রস-চাপের হ্রাস পায়, আলোকরশ্মিটি সঙ্গে সঙ্গে বামদিকে আবর্ত্তিত হয়, পক্ষান্তরে উদ্দীপক ঔষধি প্রয়োগে আলোকরশ্মি দক্ষিণে আবর্ত্তিত হয়। জীবনের উচ্ছ্বাস এবং অবসাদ—এতদিন যাহা অব্যক্ত ছিল, সঞ্চলমান আলোকরশ্মির ভাষায় তাহা ব্যক্ত হইল।

উপক্ষার ও বিষের ক্রিয়া

উপক্ষার প্রয়োগের দ্বারা প্রাণী এবং উদ্ভিদ উভয়ের হৃদস্পন্দনে সমক্রিয়া দেখা যায়। যে সমস্ত ঔষধি প্রাণী-

দেহে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে সেই সমস্ত ঔষধি বৃক্ষের রস-সঞ্চালন ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে অবসাদজনক ঔষধি প্রয়োগে উভয়ের দেহেই বিপরীত ক্রিয়া হইয়া থাকে।

প্রাণীদেহে অতি সামান্য পরিমাণেও সর্প বিষের ক্রিয়া মারাত্মক। উদ্ভিদদেহেও ঐ বিষ ঠিক অনুরূপ ক্রিয়া করিতে থাকে। হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদীয় নিদানশাস্ত্রে হৃদক্রিয়া বৃদ্ধি করিবার জন্য সূচিকাবরণ নামক এক প্রকার ঔষধের ব্যবস্থা আছে। এই ঔষধ প্রায় সহস্র বৎসর যাবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সর্প বিষ হইতে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, এই বিষ অতি সামান্য পরিমাণে উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করাইয়া দিলে তাহার হৃদক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। সেইরূপ নিদান কালে প্রাণীদেহে সামান্য পরিমাণ সূচিকাবরণ প্রবেশ করাইয়া দিলে তাহার নাড়ীর গতি এবং হৃদস্পন্দন সতেজ হইয়া উঠে।

উদ্ভিদের নাড়ী স্পন্দন

উদ্ভিদের নাড়ী স্পন্দন পর্য্যবেক্ষণ কালে পূর্ব্বগামী অনুসন্ধিৎসুগণ ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহারা উদ্দীপনা সঞ্চারের জন্য, উদ্ভিদের গাত্রে ছুরিকা প্রবেশ প্রভৃতি আঘাতের ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপ কার্য্যে অতি কুফল লাভ হয়। প্রাণীদেহে অনুসন্ধান কালে কখনো এইরূপ পন্থা অবলম্বিত হয় না। স্নায়বিক উত্তেজনার অভ্রান্ত পরীক্ষা, বিদ্যুৎপ্রবাহসঞ্জাত আবর্ত্তগতির বৈশিষ্ট্য। অধিকন্তু স্নায়বিক উত্তেজনা, নানাপ্রকার বিঘ্ন—যথা বিদ্যুৎ প্রবাহ, উত্তাপের হ্রাস, অথবা বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়। এই সমস্ত অভ্রান্ত পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে, প্রাণী এবং উদ্ভিদ উভয়ের মধ্যে একই ধারায় চেতনার প্রবাহ বহিয়া থাকে।

উদ্ভিদের প্রক্ষেপ ক্রিয়া

উদ্ভিদগাত্রে কোনপ্রকার আঘাত করিলে একটা চেতনার সঞ্চার হয়; সেই চেতনাপ্রবাহ উদ্ভিদের কাষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রতিহত হয় এবং বহির্মুখী গতি প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন পথে চলিয়া যায়। বহিরাবয়বগুলি অবিলম্বে নূতন বিপদের জন্য সতর্ক হইয়া পড়ে। প্রত্যেক অবয়বকে বিপদের জন্য সতর্ক থাকিতে হয় এবং যে কোন বিপদের সময় অবিচলিত সিদ্ধান্ত সহকারে বিনা কালক্ষেপে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয়; কারণ কোন প্রকার অ-সামঞ্জস্য ঘটিলেই উদ্ভিদের ধ্বংস অনিবার্য্য।

স্নায়বিক আন্দোলন এবং আঘাতের অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ

কি ভাবে আমরা বাহ্য জগতের সংস্পর্শে আসি—তাহা এক বিরাট রহস্য। বাহিরের আঘাত কি করিয়া আমরা ভিতরে অনুভব করি? আমাদের চেতনাস্ক্রিয়গুলি কতকটা শুঁয়ার মত, বিভিন্ন দিকে তাহারা প্রসারিত হইয়া আছে। বাহিরের নানাপ্রকার সংস্পর্শ ইহারা সংগ্রহ করে। আমাদের মধ্যে ঐ সংস্পর্শের চেতনা উদ্দীপ্ত করিবার মত একটা শক্তি এই ইন্দ্রিয়াংশগুলির মধ্যে নিহিত আছে। তাহারাই আমাদের মধ্যে সুখের বা দুঃখের অনুভূতি সৃষ্টি করে। অন্তরাধিষ্ঠিত প্রধানেন্দ্রিয়ের নিকট স্নায়বিক উত্তেজনা সে ভাবে পৌঁছায় তাহার তারতম্যানুসারে অনুভূতির তারতম্য হয়। আমরা মানবসুলভ অসম্পূর্ণতার গণ্ডীতে আবদ্ধ, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি একদিকে যেমন অনুভূতিবিহীন, অন্যদিকে তেমনি অতিরিক্ত অনুভবশীল। এমন অনেক ঘটনা ঘটে যাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না, কারণ অনুভূতির স্পর্শ এত সামান্য যে, তাহা আমাদের মধ্যে কোনপ্রকার চেতনা সঞ্চার করিতে পারে না। পক্ষান্তরে বাহিরের আঘাত এত কঠিন হইতে পারে যে, আমরা তাহাতে ক্লেশ অনুভব করি।

একটি প্রশ্ন

বাহ্যজগৎ পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি আমাদের মোটেই নাই। এখন প্রশ্ন এই যে, আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে আমরা এই ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি কিনা যাহার ফলে আমরা আমাদের অনুভবশক্তি এক দিকে যেমন বৃদ্ধি করিতে পারিব, অন্যদিকে তেমন অনুভূতির বিলোপ সাধন করিতে পারি?

আণবিক সংস্থানের ফল

আমাদের স্নায়ুমণ্ডলী বহির্দ্দেশ হইতে যে আঘাত পায় সেই আঘাতের চেতনা অণু হইতে অণুতে সংক্রামিত হইয়া আমাদের দেহাভ্যন্তরে প্রেরিত হয়। এই অণুগুলিকে পাশাপাশি সাজান এক সারি পুস্তকের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ডানদিকের শেষ পুস্তক খানিকে যদি আঘাত করা যায় তাহা হইলে পুস্তকখানা বাম দিকে হেলিয়া পড়িবে ও পার্শ্ববর্ত্তী পুস্তকখানিকে আঘাত করিবে। এইরূপে আনুক্রমিক ভাবে আঘাতের ফল পুস্তক হইতে পুস্তকে সংক্রামিত হইবে। পুস্তকগুলি যদি পূর্ব্বেই বামদিকে হেলান থাকে, তাহা হইলে এইরূপ সংস্থাপনের ফলে সামান্য আঘাতেই সেগুলি পড়িয়া যাইবে, অর্থাৎ আঘাতের ফল দ্রুততর ভাবে প্রবাহিত হইবে। পক্ষান্তরে পুস্তকগুলিকে যদি দক্ষিণদিকে হেলাইয়া রাখা যায় তবে খুব বেশী জোরে আঘাত না করিলে পুস্তকগুলি পড়িয়া যাইবে না, অর্থাৎ আঘাতের ফল দ্রুত সংক্রামিত হইবে না।

এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া আমি আবর্ত্তনগতি-নিয়ামক বৈদ্যুতিক শক্তি সহায়ে স্নায়ুমণ্ডলীর আণবিক সংস্থান পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই ভাবে আমি উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়ের দেহেই বেদনার অনুভূতির হ্রাসবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি।

একটি ভেকের দেহে আণবিক সংস্থানের একটা বিশেষ অবস্থায় ভেকটি অতি সামান্য আঘাতেই প্রবল সাড়া দেয়। সাধারণ অবস্থায় এই সামান্য আঘাত উক্ত ভেক-দেহে কোন প্রকার অনুভূতির সঞ্চার করিতে সমর্থ হয় না। সাধারণত ভেকের উপর লবণ নিক্ষেপ করিলে ভেকের ভীষণ যন্ত্রণা হয়। বিপরীত আণবিক সংস্থানের ফলে দেখা গিয়াছে যে, ভেকটি লবণের মধ্যেও পরম আরামে আছে। ইহা শুনিতে ঠিক ইন্দ্রজালের মতই মনে হয়।

ইচ্ছাশক্তির সহায়ে নিয়ন্ত্রণ

দেখা গেল যে, স্নায়বিক উত্তেজনার ফলে যে অনুভূতির সঞ্চার হয়, জড়শক্তির সহায়ে আণবিক সংস্থানের পরিবর্ত্তন করিয়া সে অনুভূতিকে বিপরীত পথে চালিত করা যায়। এখন প্রশ্ন এই যে, ইচ্ছাশক্তির সহায়ে স্নায়ুমণ্ডলীর আণবিক সংস্থান নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিনা ?

দৈহিক কার্য্যাবলীর নিয়ন্ত্রণে আমাদের ইচ্ছাশক্তি কি ভাবে কাজ করিয়া থাকে, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ এখনো পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করেন নাই। অভ্যাস এবং চিত্ত সংযমের দ্বারা আমরা ইচ্ছাশক্তি যে কত বৃদ্ধি করিতে পারি, তাহা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন। আভ্যন্তরীন ইচ্ছাশক্তি সহায়ে শরীরাভ্যন্তরস্থ অণুগুলির সংস্থানের পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা যে অনুভূতির হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষ মনোনিবেশ বা আশার ফলে যে অনুভব শক্তি বৃদ্ধি পায় তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

মানুষ অবস্থার দাস নহে

দেখা যাইতেছে যে, বাহিরের আঘাতের তারতম্যে যেমন অনুভূতির তারতম্য ঘটিয়া থাকে, ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের তারতম্যেও অনুরূপ ফল হওয়া সম্ভব। সুতরাং ইচ্ছাশক্তি সহায়ে স্নায়ুমণ্ডলী নিয়ন্ত্রিত করিয়া আঘাতের অনুভূতির হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, বাহ্য জগৎই সর্ব্বত্র জয়ী নহে এবং মানব আর অদৃষ্টের দাস নহে। তাহার ভিতরে এমন একটা শক্তি নিহিত আছে, যাহার সহায়ে সে অনিষ্টকর পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ। যে পথ অবলম্বন করিয়া বাহ্য জগতের অনুভূতি তাহার অন্তরর জ্যে প্রবেশ করে, সে পথ রোধ করা বা বিস্তার করা তাহারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এ পর্য্যন্ত যাহা তাহার নিকট অস্ফুট ছিল তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে। অথবা ইচ্ছা করিলে সে আত্মসমাহিত হইয়া বাহ্য জগতের হট্টগোল হইতে দূরে থাকিতে পারে।

এই ভাবে উদ্ভিদ হইতে প্রাণীতে আমরা জীবনের ক্রমাভিব্যক্তি দেখিতে পাই এবং আরো দেখিতে পাই যে, জীবনের ধারা এই অভিব্যক্তির ক্রমানুসারে বিকাশ লাভ করিয়া এমন এক স্তরে পৌছায় যেখানে সে আর অদৃষ্ট বা অবস্থার দাস নহে, সে তথায় নিজেই অদৃষ্ট এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

ভাল লেগেছিল মোর—

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বক্সী

ভাল লেগেছিল মোর, তাই পথ পরে বসি'
ঝঙ্কারিয়া বীণা খানি অকারণ আনন্দে উচ্ছ্বসি'
গাহিয়াছি গান—
প্রভাতের-বিহঙ্গের মতো ; জেগেছিল উল্লাসেতে প্রাণ।
গাহিয়াছি, নাহি জানি কার আগমনী
যেন কার চরণের-ধ্বনি
বেজেছিল বুকে মোর ; সকল অন্তর
দখিন সমীরে বনকুঞ্জ-সম তুলেছিল ব্যাকুলমর্ম্মর,
কম্পিত মর্ম্মের বন-ছায়,
কেশের সুগন্ধ কার পেয়েছিনু, ভোরের হাওয়ায় ;
কার আঁখি রাগালসে অরুণ-গগন
হয়েছিল রঙেতে মগন ;
কার হাসি
সুনীল দিগন্ত ভরি' স্বপ্নভরা জেগেছিল উদাসি' উদ্ভাসি'
করেছিল মাধুর্য্য রচনা—
বিস্মরি' আপনা
তাই, প্রতীক্ষায় আকুলিত প্রাণ—
অর্দ্ধ-রজনীর ক্ষীণ শশী সম আমি, গেয়েছিনু গান॥

এই পথে কত লোক আসে কত যায়
বাজে চরণের-ধ্বনি, ধূলি মেঘ ওড়ে পায় পায়,
কেহ হাসে, কেহ কাঁদে আসি'
শোনে মোর সহজিয়া মেঠোসুরে বেজে-ওঠা বাঁশি
কারা চলে যায়, কভু পাতেনাকো কান ;
তবু, প্রান্তরের তলে নামহীন তুচ্ছ ফুলসম, গাহিয়াছি গান॥

বেলাশেষে, সূর্য্যাস্তের রক্তিম-আলোকে
অশ্রুভরা চোখে
এ ধরণীর-ধূলিতলে শেষ-গীতি দেব অঞ্জলিতে
বিদায় বেদনা-ভরা চিতে।
যারে ডাকি'
ফুটাইনু পুষ্পগুলি ভরি' মোর বনকুঞ্জ শাখি
ভরিনু মর্ম্মের-ডালা নিমেষে নিমেষে
সেই মোর প্রতীক্ষিতা মোর দ্বার দেশে
নাহি যদি আসে—নাই এল ; কোন ক্ষতি নাই
ফুটে-ওঠা ফুলগুলি ফেলে যাব তাই
ফেলে যাব আমি তার তরে, এই পথের-ধূলায়
এ পথেতে আসে যদি পরশ করিবে নাকি পায় ?

বেদনার রক্ত-মেঘ সম জানি আমি এ জীবন
হবে অবসান,
তবু ভাল লাগে মোর, এ ক্ষুদ্র জীবনে
ক্ষণে ক্ষণে
যুগে যুগে মানবের প্রেমের আলিম্পনে আঁকা
স্বপনের মায়া ভরা, সঙ্গীতের সুধা দিয়ে' মাখা
এ বিচিত্র, এ বিপুল, এ সুন্দর পৃথিবীর ক্ষুদ্র
এক কোণে,
সুখে-দুঃখে বসি' একমনে,
প্রদীপের শিখা সম জ্বলেছিনু, গেয়েছিনু গান॥

মহিলা প্রগতি

ভারতবর্ষের নারীজাতি অন্যান্য দেশের নারীজাতির শিক্ষার তুলনায় অনেক পিছনে পড়িয়া আছেন এই কথাটি আমাদের মনে পাষাণ-লিপির মত খোদিত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু নারীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে জাতির যে চিন্তা তাহা একান্ত চিন্তার কারণই থাকিয়া গিয়াছে। নারীজাতি সর্ব্ববিষয়ে সমধিক শিক্ষিতা না হইলে যে দেশের ভাষা, আশা, স্বাস্থ্য ও সম্পদ পরিপূর্ণতা লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই তাহাও এ দেশীয় নারী ও পুরুষ সকলেই জানেন। ইহা সত্ত্বেও নারীজাতির শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ কোনও চেষ্টার লক্ষণ দেখা যায় না।

আমাদের মহিলারাই যে তাঁহাদের নিজ চেষ্টায় নারী-জাতির শিক্ষা ও সামর্থ্যের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন কতকগুলি অনুষ্ঠানের সংবাদে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ভারতবাসীমাত্রেরই আনন্দের কারণ।

কিছুদিন পূর্ব্বে আহম্মদাবাদে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী আম্বালা সরাভাইর সভানেত্রীত্বে গুজরাট প্রাদেশিক নারী-শিক্ষা সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রায় তিন শত মহিলা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্তা এস্. তায়েব্‌জী নারীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধীয় জটিল সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এবং মুসলমান নারীদিগের শিক্ষা সমাধানের জন্য সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নারীজাতির শিক্ষার অব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব একটি কারণ। তিনি পুরুষদিগের সমান সুযোগ ও সুবিধা নারীদের জন্যও দাবী করেন। নারীদিগের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন ও নারীজাতির মধ্যে শারীর চর্চ্চা প্রবর্ত্তনের উপর তিনি বিশেষ ভাবে জোর দেন্।

একটি প্রস্তাবে বালিকাদিগের বিবাহের বয়স যোল বৎসর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় এবং স্কুলসমূহে বালিকাদিগের শারীর চর্চ্চা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন বলিয়া স্থির হয়।

অন্য একটি প্রস্তাবে নারী-শিক্ষার প্রতি অনুকূল জনমত সৃষ্টি করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়।

গত ২৪শে ডিসেম্বরও অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরী হলে শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে মহিলাদিগের একটি সভা হয়। উক্ত সভায় মাননীয়া ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবী, লেডী বসু, শ্রীযুক্তা সরলা দেবী, শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, শ্রীমতী শান্তা দেবী, শ্রীমতী লতিকা বসু প্রভৃতি বহু মহিলা যোগদান করেন।

স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা-সংস্কার, ভারতীয় সঙ্গীতের কলেজ স্থাপন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক স্ত্রী-শিক্ষা, পর্দ্দা অপসারণ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পুনাতে যে মহিলা-সম্মিলন হইবে তাহাতে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী, শ্রীমতী হেমলতা সরকার, শ্রীমতী লতা রায় ও শ্রীমতী লতিকা বসু ডেলিগেট্‌রূপে উপস্থিত হইবার জন্য মনোনীত হন্।

গত ২রা জানুয়ারী কলিকাতা ভবানীপুর অঞ্চলে ৮নং কাটুয়াকুঠী লেনে মৌলভী গোলাম রসুল সাহেবের বাড়ীতে মোস্লেম মহিলা-সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। শ্রীরামপুরের বিবি নূরুন্নেসা খাতুন সাহিত্য সরস্বতী বিদ্যাবিনোদিনী সভানেত্রী হন্। সভায় প্রায় চারিশত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে মোসম্মৎ রদর্ উন্নেসা সাহেবা কোর-আন্ হইতে একটি সুরাহ্ আবৃত্তি

করেন। সভায় নারী-শিক্ষার উপযোগিতা, সংবাদ পত্রের আবশ্যকতা ইত্যাদি বিষয় বাংলায় ও উর্দ্দুতে মোসম্মৎ বদর উন্নেসা, কামরুন্নেসা, মন্নুর আখ্তর, জহান আরাম, মোবারক আখ্তর, বাজেকুয়া খাতুন, শাহ্জাদী বেগম ওজমোন আরাম প্রমুথ মহিলাবৃন্দ প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভানেত্রী বাংলায় বক্তৃতা দেন্; মুসলমান রমণীদের ভিতর শিক্ষার প্রসারের জন্যই তিনি বিশেষ অনুরোধ করেন।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সভায় গৃহীত হয়।

১। মোস্লেম মহিলাদের শিক্ষার জন্য প্রতিবৎসর বাজেটে কিছু টাকা পৃথক্ করিয়া দিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হোক। ২। বাংলার প্রত্যেক মহকুমা-শহরে একটি করিয়া মধ্য-ইংরেজী মোস্লেম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরকে অনুরোধ করা হোক্। ৩। মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বাংলার প্রতি জেলায় ও মহকুমাতে মোস্লেম মহিলা-সমিতির শাখা স্থাপিত হওয়া দরকার। ৪। একখানা মহিলাদের সম্পাদিত মাসিকপত্র চালাইবার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করা হোক্।

প্রত্যেক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য যাহাই হোক্, ইহাতে যে সমষ্টিগত ভাবে মহিলা-সমাজের শিক্ষা ও উন্নতির ব্যবস্থা হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। উচ্চতর শিক্ষার সহিত ব্যক্তিগত, সমাজগত বা সম্প্রদায়গত পার্থক্য বিদূরিত হইবারই সম্ভাবনা। যেমন করিয়াই হোক্ প্রত্যেক পরিবারে একজন করিয়া শিক্ষিতা মহিলা থাকিলেও জাতির অনাগত সন্তানগণ যে দেহে ও মনে শক্তিমান্ হইবে ইহাই জাতির পক্ষে পরমলাভ।

পুনায় নিখিল-ভারত নারী-সম্মিলনীর অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী সাংগলীর রাণী সাহেবা ও সম্মিলনীর অধিনেত্রী বরোদার মহারাণী উভয়েই যুক্তিপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন।

মহারাণী ভারতীয় নারীজাতিকে জাগ্রত হইতে আহ্বান করিয়াছেন। সমাজের দুর্নীতি ও অত্যাচার অপনোদনের জন্য নারীগণ নিজেরা চেষ্টা না করিলে ইহা সম্ভব হইবে না। বরোদার মহারাণী স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে অনেক শ্রম করিয়াছেন, তাই নিজের লব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে বলিয়াছেন, ভারতীয় নারীগণের নানা কর্ম্মক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতির একটি উল্লেখযোগ্য কারণ—ভারতীয় পুরুষগণের নারী-প্রগতি আন্দোলনের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি। অন্য দেশে এরূপ সহানুভূতির একান্ত অভাব।

আজকাল পাশ্চাত্য দেশের ধূয়া ধরিয়া অনেক কল্পনা-প্রবণ ভারতীয় পুরুষ ও রমণী, এ দেশেও স্ত্রী-পুরুষের একত্র শিক্ষা দিবার ব্যবস্থার জন্য (co-education) আন্দোলন শুরু করিয়াছেন। এই সম্পর্কে মহারাণী বলেন, বালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় একান্ত আবশ্যক, কারণ তাহাতে তাহাদের নিজস্ব মনোবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইবার সুযোগ পায়।

স্ত্রীলোকদিগের সম্পত্তির অধিকার, নাবলকের অভিভাবিকা হইবার অধিকার ইত্যাদি বিষয় তাহাদের যে সকল অভাব অভিযোগ রহিয়াছে, সে সম্বন্ধেও তদন্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তিনি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন।

আশা করা যায়, দেশের শিক্ষিতা মহিলারা ভারতীয় আদর্শে স্ত্রী-শিক্ষাপদ্ধতি গড়িয়া তুলিয়া সমাজ ও দেশের উন্নতি সাধনে যত্নবতী হইবেন।

রবীন্দ্রনাথ

—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আমি আজো দেখি নাই সাজাহান গড়িয়াছে যে তাজমহল,
আমি শুধু পড়িয়াছি তোমার কবিতা ;
আমার কল্পনাবধূ তাই আজি উচ্ছ্বসিত, উদ্দাম, চঞ্চল,
অনবগুণ্ঠিতা !

তোমার বেদনা তারে উদাসিনী করেছে উতলা,
নাহি জানে কারুকার্য্য, নাহি জানে চারুশিল্পকলা,
শুধু তব আঁখি হতে চুরি করি' আনি' অশ্রুজল
আমার অন্তরলোকে গড়িয়াছে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

যে প্রিয়ারে চিনি নাই আজিকে চিনায় তারে তব দগ্ধ ব্যথা,
তাহারে হারায়ে তুমি বুঝায়েছ হে প্রেমিক তার অমূল্যতা।
ছন্দের বন্ধন ত্যজি' যে অন্তর-দুঃখ তব হোল চিরন্তন,
মম চিত্ত-অন্তঃপুরে উদ্বেলিছে মৌনতায় সে দূর-ক্রন্দন।
—তোমার প্রার্থনা-সাথে আমারো ব্যাকুল কান্না উর্দ্ধপানে
উঠিছে ধ্বনিয়া
'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া !'

সে কান্নায় মম চিত্ততীর্থে তুমি গড়িয়াছ আজ
বিশ্বব্যাপ্ত বিরহের তাজ্ !

———

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের

সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

চিঠি লিখতে বসলেই, সর্ব্বাগ্রে তার পাঠ লিখতে হয়। পাঠ অবশ্য নিজে রচনা করতে হয় না। তা পূর্ব্ব থেকেই সমাজ কর্ত্তৃক রচিত হয়ে রয়েছে, সেই বিধিবদ্ধ বাক্যসমূহ আমরা নির্ব্বিচারে মুখস্থ করে পত্রস্থ করি। এ পাঠ অবশ্য সকল ভাষায় সকল সমাজে এক নয়। দেশভেদে, সম্প্রদায়ভেদে, পত্রের মুখপত্র নানা আকার নানা রূপ ধারণ করে।

কিন্তু এ সকলের বাহ্য আকারে যে প্রভেদই থাকুক না কেন, সকলেরই বক্তব্য এক। সকলেরই উদ্দেশ্য লেখকের হীনতা ও দীনতা প্রকাশ করা। যিনি যে ভাষাই ব্যবহার করুন, যতই না কেন শ্রুতিমধুর বাক্য প্রয়োগ করুন, সকল পাঠেরই নির্গলিতার্থ হচ্ছে 'সবিনয় নিবেদন'। অর্থাৎ নিবেদনটা আসে পরে, তার আগে আসে বিনয়,—এই আশায় যে, লেখকের নিবেদনটা যদিও পাঠকের মনঃপূত না হয়, বিনয়টুকু ত হবেই। বিনয় ঘুস্ দিয়ে পাঠকের মেজাজ খুশ্ করাই এর ধর্ম্ম।

বক্তৃতা অর্থাৎ লোকসমাজে মৌখিক নিবেদনটাও এই একই নিয়মের অধীন। সভামাত্রেরই সভাপতির পক্ষে প্রথমেই বিনয় প্রকাশ করাটা একটা অবশ্যকর্ত্তব্যের ভিতর দাঁড়িয়ে গিয়েছে; এবং এ কর্ত্তব্য পালন করবার উপযুক্ত বাঁধিগতেরও সৃষ্টি হয়েছে।

সভাপতিকে কার্য্যারম্ভ আগে এই কথা বলে মুখ খুলতে হয় যে, তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করবার যোগ্যপাত্র নন। আমি কিন্তু এ ক্ষেত্রে উক্ত মামুলি বিনয়ের অভিনয় করতে পরাঙ্মুখ। ও হচ্ছে আসলে বৃথা বাক্যব্যয়। যে কথা একশ' বার শুনেছি, সে কথা আবার শুনলে শ্রোতার তা এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়, তার মরমে প্রবেশ করে না। যুগ যুগ ধরে পুনরুক্তির ফলে কথা মাত্রেই কথার কথা হয়ে যায়।

তা ছাড়া এ জ্ঞান আমার আছে যে, আমার মত সাহিত্যিকের মুখে বিনয় শোভা পায় না, শোভা পায় শুধু সাহিত্য-রাজ্যের রাজারাজড়াদের মুখে। এর একটি ক্লাসিক উদাহরণ দিচ্ছি। কালিদাস রঘুবংশের প্রথমেই লিখে-ছেন—

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥

অর্থাৎ—আমি মূঢ় কবিযশপ্রার্থী হয়ে হাস্যাস্পদ হব, কেননা আমার পক্ষে এ প্রয়াস বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার মত—

পূর্ব্বোক্ত উক্তি হচ্ছে সাহিত্যিক বিনয়ের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু এ কথা কালিদাস কখন বলেছিলেন?—যখন তিনি সে কালের বিদগ্ধমণ্ডলীর কাছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে গণ্য হয়েছিলেন। রঘুবংশ কালিদাসের শেষ কাব্য! মেঘদূত, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ রচয়িতার মুখে এ বিনয় শোভা পায়। কে না জানে যে, বড়লোক ছুটি ছোট কথা কইলেই আমরা মুগ্ধ হই। আভিজাত্যের সঙ্গে সৌজন্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কিম্বদন্তি এই কাল্পনিক ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অপরপক্ষে কালিদাস তাঁর

প্রথম কাব্যে যে আত্মপরিচয় দেন, তার ভিতর বিনয় নেই —যদি কিছু থাকে ত আছে স্পর্দ্ধা। মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রথমেই তিনি সূত্রধারের মুখ দিয়ে সভাসদ্‌দের শুনিয়ে দিয়েছেন যে—

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং।
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম॥
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে।
মূঢ় পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি॥

অর্থাৎ কাব্য পুরোনো বলেই সাধু হয় না, আর নূতন বলেই গর্হিত হয় না। সাধু ব্যক্তিরা কাব্যের নূতনত্ব প্রাচীনত্ব নয়, তার গুণাগুণ পরীক্ষা করেই তার ভজনা করেন। কেবল মূঢ় ব্যক্তিরাই পরের মুখে ঝাল খায়।

কালিদাসের প্রথম বয়সের ও তাঁর শেষ বয়সের উক্তি দুটির উল্লেখ করলুম এই সত্যের পরিচয় দেবার জন্যে যে, বড় লেখকের মুখে বিনয় যেমন ভূষণ, নবীন লেখকের মুখে স্পর্দ্ধাও তেমনি অস্ত্র। কিন্তু যে নবীন-লেখকও নয় বড় লেখকও নয়, তার মুখে ও দুইয়ের কোনটিই শোভা পায় না। যেহেতু লেখায় আমার হাতে খড়ি কাল হয় নি, আর আজও পাকা লেখক হয়ে উঠি নি, সে কারণ আমার পক্ষে আমার সাহিত্যিক গুণাগুণ সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয়। তা ছাড়া যখন ভোটের প্রসাদে এ পদ লাভ করেছি, তখন আমার যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচারসহ নয়। ইলেক্‌সন্‌ জিনিষটিই ত যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের অভ্রান্ত বিলেতি কল।

২

আমি যে আপনাদের কাছ থেকে নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে মহা আনন্দিত হয়েছি, তার প্রমাণ আপনাদের আহ্বানে আমি দ্বিধা না করে একটানা ন'শ' মাইল পথ অতিক্রম করে এ সভায় এসে উপস্থিত হয়েছি। এ রকম দেশভ্রমণ আমার পক্ষে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা নয়। আমি আমার বন্ধু শ্রীমান দিলীপকুমার রায়ের মত ভ্রাম্যমান নই, অপরপক্ষে আমি হচ্ছি বাঙলায় যাকে বলে কুণো লোক। এমন কি কলকাতা সহরেও ঘর ছেড়ে সভাসমিতিতে উপস্থিত হতে আমি স্বতঃই নারাজ। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকাই আমার বদ্ধমূল অভ্যাস। আর এই একঘরে হয়ে থাক্‌বার যুগসঞ্চিত অভ্যাস এখন স্বভাবে পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া আমার এখন দেহের কলকব্জা সব ঢিলে হয়ে এসেছে। আমি যে এই বিকল দেহযন্ত্রটাকে ফিন্‌ফিনে গরমের দেশ থেকে কন্‌কনে শীতের দেশে টেনে নিয়ে এসেছি, সে দিল্লীর টানে নয়, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের টানে।

এই দিল্লী সহরটার সঙ্গে আমার মনের নাড়ীর কোনও যোগ নেই। দিল্লী সাহিত্যের রাজধানী নয়। অন্ততঃ যে সব ভাষার সঙ্গে আমি পরিচিত, সে সব ভাষার সাহিত্যের ত নয়ই। আমি যদি সাহিত্যিক না হয়ে ঐতিহাসিক হতুম, তাহলে অবশ্য এ সহরের মায়ায় চিরআবদ্ধ হয়ে পড়তুম। গত হাজার বৎসরের ইতিহাস নামক ট্রাজেডি এ নগরীর পৃষ্ঠে খোদিত পাষাণের আরক্ত অক্ষরে লিখিত রয়েছে। এ সহরের আবেদন লোকের কানের কাছে নয়, চোখের কাছে। Archæologist-দের কাছে, অর্থাৎ যাঁরা পাষাণের পেটের কথা জানেন তাঁদের কাছে, দিল্লী সহর একটি বিরাট প্রস্তরলিপি। সে লিপি আমার কাছে আরবী ও ফার্সি হরফের মতই অপরিচিত। আমি যখনই দিল্লীর সম্মুখস্থ হই, তখনই শুনতে পাই যে, এখানকার গম্বুজে, মস্‌জিদে, মিনারে, কবরে, শতমুখে একটিমাত্র বাণী ঘোষণা করছে; আর সে বাণী এই—Vanity of vanities, all is vanity.

এ বাণীর উপর এ কালের সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত নয়। আমরা এ সত্যের প্রতি বিমুখ হয়েই অগ্রসর হতে চাই। তাই মানুষের বিরাট অহঙ্কারের এই স্তূপীকৃত ধ্বংসাবশেষের সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে আমাদের সরস্বতী ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। বাঙলা দেশে আমার নিজ হাতে গড়া এবং হাতধরা জনৈক সাহিত্যিক আছেন, যিনি এখানে এলে সম্ভবত নানাবিধ পূর্ব্বস্মৃতিতে উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। কিন্তু তাঁকে আমি সঙ্গে আনতে পারি নি—তিনি অনিমন্ত্রিত বলে। তাঁর নাম হচ্ছে বীরবল!

৩

আমি যে আপনাদের ডাক শুনে এখানে ছুটে এসেছি, সে কেবল বিদেশে বঙ্গ-সরস্বতীর পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্য, এবং তাঁর উৎসবে যোগদান করবার জন্য। বাঙলা সাহিত্যের লম্বা ইতিহাস আমাদের পিছনে পড়ে নেই—পড়ে আছে আমাদের সুমুখে। এ সাহিত্যের স্মৃতিতে মগ্ন থাকবার সুযোগ আমাদের নেই, এর ভবিষ্যৎ নিয়েই আমাদের কারবার। কারণ বঙ্গ-সরস্বতীর মন্দির আমাদের নিজহাতে কায়ক্লেশে গড়ে তুলতে হবে—আর তার জন্য চাই বহু শিল্পী এবং এ-যুগে বহু স্বেচ্ছাসেবক। যেমন পুরাকালের ধর্ম্ম-মন্দির সব ভক্তের দল গড়ে তুলেছে, এ যুগের সরস্বতীর মন্দিরও তাঁরাই গড়ে তুলবেন, যাঁদের বাঙলা-ভাষা ও বাঙলা-সাহিত্যের প্রতি পরাপ্রীতি অর্থাৎ অহৈতুকী প্রীতি আছে। বঙ্গ-সাহিত্যের ভাবী উন্নতি ও ঐশ্বর্য্যের উজ্জ্বল রূপ আমি কল্পনার চক্ষে বরাবরই দেখে আসছি। এ মন্দির অবশ্য মেঘরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত নয়। এর গোড়াপত্তন বাঙালীরা বঙ্গভাষার জমিতেই করেছে। সুতরাং একে সুগঠিত করে তোলবার কোনই অন্তরায় নাই —একমাত্র আমাদের ঔদাসীন্য ব্যতীত। বহু লোকের মনে যদি এই নবভক্তি স্থান পেয়ে থাকে, তাহলে বঙ্গ-সাহিত্য যে অচিরে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করবে, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। এতদিন আমরা বাঙলা দেশে জনকতক মিলে এই সাধনায় ব্যাপৃত ছিলুম। বাঙলার বাইরেও যে বঙ্গ-সরস্বতীর এত ভক্ত আছে, দুদিন আগে সে জ্ঞান আমাদের ছিল না। আমার নিজের মনে একটা ধারণা ছিল যে, প্রবাসী-বাঙালীরা শুধু দেশহিসেবে প্রবাসী হন নি, মনেও প্রবাসী হয়েছেন। এ ধারণার মূলে একটি ছোট্ট ঘটনা আছে। কত ছোটখাটো ঘটনার বীজ থেকে কত বড় বড় ভুল ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়, তারই পরিচয় দেবার জন্য এই ভুল ধারণার মূলস্বরূপ একটি অকিঞ্চিৎকর ঘটনার উল্লেখ করছি।

৪

এ ঘটনা এতদিন পূর্ব্বে ঘটেছিল যে, সেটিকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বললেও অত্যুক্তি হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে একদিন একটি ভারতবর্ষীয় যুবকের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনিও বিদ্যার্থীহিসেবেই সে দেশে গিয়েছিলেন, আর আমরা দুজনেই একই বিদ্যা অর্জ্জন করতে সমুদ্র লঙ্ঘন করেছিলুম। তাঁর নামরূপের পরিচয় থেকে বুঝলুম যে, তিনি আমারই স্বজাতি—অর্থাৎ বাঙালী। তিনি যে বাঙালী নন, এমন ভুল করা কোনও বাঙালীর পক্ষে অসম্ভব ছিল; কারণ তাঁর দেহযন্ত্রটি মামুলি বাঙালী ছাঁচেই ঢালাই করা হয়েছিল। সে মূর্ত্তির রেখা ও বর্ণ আমাদের অনুরূপই ছিল। প্রথম প্রথম আমরা উভয়ে ইংরেজী ভাষায় কথোপকথন আরম্ভ করি—কারণ অপরের কাছে শুনেছিলুম যে, তিনি বাঙালী হলেও এক-জন প্রবাসী বাঙালী। শেষটা তাঁকে মুখফুটে বাঙলায় জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি বাঙলা জানেন? তিনি হেসে উত্তর দিলেন, সে হামি ভাল জানি। বলা বাহুল্য যে এ উত্তর শুনে আমি একটু চমকে উঠেছিলুম। তাঁর মুখের 'ভাল জানি' কথাটা আমি অসন্দিগ্ধ চিত্তে গ্রাহ্য করতে অবশ্য পারি নি। আমি শুধু ভাবতে লাগলুম—দন্ত্য 'স' সংস্কৃত রীতিতে উচ্চারণ করলে আমাদের কানে তা এত বিসদৃশ ঠেকে কেন? শেষটা বুঝলুম, সংস্কৃত শব্দ বাঙলার মত উচ্চারণ করলে তা যেমন অসংস্কৃত হয়, বাঙলা শব্দও সংস্কৃতের মত উচ্চারণ করলে তাদৃশ অ-বাঙলা হয়। কিন্তু 'আমি' যে কি করে 'হামি'তে রূপান্তরিত হয়, স্বরবর্ণের আদি অক্ষর কি ফিকিরে ব্যঞ্জন-বর্ণের শেষ অক্ষরে পরিণত হয়, তার হদিস্ আমি দুদিন আগে পাই নি। সে যাই হোক, এই নব-পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে বাঙলা ভাষায় আলাপ এক কথাতেই বন্ধ হল। অতঃপর উভয়েই ইংরেজী ভাষার আশ্রয় নিলুম। কারণ ও ভাষায় আমাদের উভয়েরই জবান যখন সমান দুরস্ত, দুজনেই যখন ইংরেজী ব্যাকরণ ও উচ্চারণের শ্রাদ্ধ করছি, তখন কার ভুল কে ধরবে। আমাদের সদ্য-কল্পিত লাট-দরবারের বক্তারা কি কেউ কারও ইংরেজীর খুঁত ধরে?

৫

সেই থেকেই আমি ধরে নিই যে, প্রবাসী-বাঙালীর মুখের বাঙলা আমাদের মুখের হিন্দীর অনুরূপ। দুয়ের

মধ্যে প্রভেদ এই যে, হিন্দী আমরা একদম শিখি নি, অপর-পক্ষে প্রবাসী-বাঙালীরা বাঙালা একদম ভোলেন নি। ফলে হিন্দী-সাহিত্যের আদর আমাদের কাছে যদ্রূপ, বাঙলা-সাহিত্যের আদর তাঁদের কাছেও তদ্রূপ।

উনবিংশ শতাব্দীতে সংগৃহীত আমার উক্ত ধারণা বিংশতাব্দীতে যে সম্পূর্ণ অচল, সে সত্যের পরিচয় আমি বছর পাঁচছয় আগে পাই। আমার সেই বিলাত-প্রবাসী বাঙালী বন্ধুটি সে যুগের প্রবাসী-বাঙালীর একটি খাঁটি নমুনা কি না জানি নে; যদি হন তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এ বিষয়ে প্রবাসী-বাঙালীদের মনোরাজ্যে যুগান্তর ঘটেছে। এমন কি আমার সময়ে সময়ে এ সন্দেহ হয় যে, আপনাদের কাছে বঙ্গ-সাহিত্যের যতটা আদর আছে, বাঙলাদেশে ততটা নেই। জানি নে এ কথা ঠিক কিনা; কিন্তু এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, আপনারা যে উৎসাহের সঙ্গে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা করছেন, তা যথার্থই অপূর্ব্ব। আর এক কথা, আপনারা এ যুগের বাঙলা-সাহিত্যকে যতটা আমল দিতে প্রস্তুত, বাঙলার লোকে সম্ভবতঃ ততটা নয়। এর জলজ্যান্ত প্রমাণ এই যে, মাদৃশ লেখককেও আপনারা সাহিত্যিক বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি।

৬

অবশ্য আজ থেকে বোধ হয় দশ বারো বৎসর আগে আমি উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির উচ্চ পদ লাভ করি। কিন্তু সে আসন গ্রহণ করে আমি নিজেকে তাদৃশ ধন্য মনে করি নি, আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করে যতদূর করছি। কারণ উত্তরবঙ্গ আমাকে যে এতাদৃশ সম্মানিত করেন, আমার বিশ্বাস তার ভিতর একটু অসাহিত্যিক কারণ ছিল।

উত্তরবঙ্গ হচ্ছে আমার স্বদেশ। সুতরাং সে সভার কর্ম্মকর্ত্তারা "দেশকো ভাই" বলে আমার প্রতি একটু পক্ষ-পাত যে দেখান নি, এমন কথা আমি জোর করে বলতে পারি নে। তৎসত্ত্বেও তাঁদের নিমন্ত্রণের ভিতর একটু কিন্তু ছিল।

আমাকে তাঁরা আমার অভিভাষণের গায়ে পোষাকী ভাষা পরিয়ে নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। আমি অবশ্য তাতে স্বীকৃত হই—এই ভয়ে যে, অসাধু ভাষায় লিখ্‌লে উত্তরবঙ্গ পাছে আমার প্রতি অদক্ষিণ হয়ে ওঠেন। লোকে লোক-লাঞ্ছনা মেরেকেটে একরকম সওয়া যায়, কিন্তু ঘরে গুরুগঞ্জনা অসহ্য। কাজেই সে অভিভাষণ আমি লিখে নিয়ে যেতে পারি নি, 'তাহা আমাকে লিখিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল।' ফলে আমার বক্তব্য তাঁদের মনোমত হয়েছিল কিনা জানি নে, কিন্তু তা তাঁদের বর্ণশূল হয় নি।

সে যাই হোক, আপনারা যে আমাকে এখানে ভাষার সাধুবেশ ধারণ করে আসতে আদেশ করেন নি, এর জন্য আমি আপনাদের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কারণ সাহিত্য-রাজ্যেও বারবার বহুরূপী সাজাটা কষ্টকর না হলেও লজ্জাকর।

এ পুরাকাহিনী শোনাবার উদ্দেশ্য আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, আমরা যাকে নব-সাহিত্য বলি, তার ভাষারও একটু নবীনতা আছে। সাহিত্যের ভাষার এই মোড়-ফেরানোর ব্যাপারে আমার কতকটা হাত আছে, আর প্রধানত সেই হিসাবেই সাহিত্য-সমাজে আমি নিন্দিত ও প্রশংসিত—অর্থাৎ বিখ্যাত। আমাদের এ ভাষা চল্‌তি ভাষা বলেই পরিচিত। যখন এ ভাষাকে আমরা প্রথমে সাহিত্যে প্রমোশন দিই, তখন জনকতক বাঙলা সাহিত্যের দলপতি এবং তাঁহাদের দলবল মহা হৈ চৈ সুরু করেন এই বলে যে, সাহিত্য গেল, সমাজ গেল, ধর্ম্ম গেল। 'করিয়া' 'করে' রূপ ধারণ করিলেই, ক্রিয়াপদের লেজ কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হলেই, সে লেজুড়ের শক্তি যে এতদূর প্রলয়ঙ্করী হয়ে ওঠে, এ কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নি। কোনও জিনিষেরই সৃষ্টি ও প্রলয় অত তড়ি-ঘড়ি হয় না। কিন্তু সমালোচকের তাড়নায় আমরা পাঠকের মহামান্য উচ্চ আদালতে সাধুভাষা বনাম চল্‌তি ভাষার মামলা রুজু করতে বাধ্য হই। তারপর বছর পাঁচেক ধরে নানারূপ বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক, দার্শনিক

অদার্শনিক সওয়াল-জবাবের ফলে এ ক্ষেত্রে আমরা সে মামলায় জয়লাভ করেছি। তথাকথিত চল্‌তি বাঙালা এখন সাধুভাষার সঙ্গে সাহিত্য-ক্ষেত্রে এক পংক্তিতে বসবার অধিকার লাভ করেছে। যা আজ হয়েছে, তাকে ভাষার dyarchy বলা যেতে পারে। এতেই আমরা কৃতার্থ, কারণ সাধুভাষার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মামলা আমরা আনি নি; শুধু চলিত বাঙলারও যে সাহিত্যের রাজ্যে প্রবেশের অধিকার আছে, তাই প্রমাণকরতে চেয়েছিলুম।

৭

আমাদের ভাষার অন্তরে যে নবীনতা আছে, তার প্রমাণ নবীনের দলই ছিলেন আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আপনাদের ঘাড়ে গতানুগতিক মতামতের চাপ ততটা নেই, যতটা আছে আমাদের উপরে; কারণ বাইরে যেতে হলেই অনেক পৈতৃক আসবাবপত্র ঘরে ফেলে আস্‌তে হয়, মনের আসবাবপত্রও। সুতরাং আশা করছি যে—

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং"

কালিদাসের এ উক্তির সত্যতা আপনারা যত সহজে হৃদয়ঙ্গম করবেন, যে-সব বাঙালীর কাছে 'ঘর থেকে আঙিনা বিদেশ' তারা তত সহজে করবে না।

ভাষার গুণাগুণ প্রয়োগসাপেক্ষ। একটি উদ্ভট সংস্কৃত শ্লোক বলে যে, 'বীণা বাণী অসি ও নারীর' নিজস্ব কোনও গুণ নেই; যার হাতে তা পড়ে, তার উপরই তার গুণাগুণ নির্ভর করে। ও শ্লোকের অন্তর থেকে নারীকে সসম্মানে মুক্তি প্রদান করলে বাদবাকী কথা আমরাও নির্ভয়ে গ্রাহ্য করতে পারি—বিশেষত বাণী সম্বন্ধে! কারণ ভাষা জিনিষটি অসি হিসাবেও ব্যবহার করা যায়, বীণা হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। তা যে যায় তা তিনিই জানেন, যাঁর রবীন্দ্রনাথের গদ্যপদ্যের সঙ্গে ঘনি পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথের পদ্য যাঁদের হৃদয় স্পর্শ করতে না পারে, তাঁর গদ্য হেলায় তাঁদের হৃদয় বিদ্ধ করিতে পারে।

আসল কথা এই যে, সাধু ভাষার সঙ্গে আমাদের ভাষার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। তাঁরাও যে সর্গম নিয়ে কারবার করেন, আমরাও সেই সর্গম নিয়ে কারবার করি। প্রভেদ এই যে, সাধুভাষার অচল ঠাটের পরিবর্ত্তে আমরা সচল ঠাটে সাধনা করছি। তবে এ তর্ক যে বাঙলা দেশে উঠেছিল, সেটি এক হিসাবে আমাদের সৌভাগ্যের কথা। কারণ এ আলোচনার ফলে সকলেরই বঙ্গভাষার উপর দৃষ্টি পড়েছে; এবং ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁদের মাতৃভাষার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হয়েছেন। যেমন বাঙালা দেশে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হয়েছেন।

৮

মাতৃভাষার মাহাত্ম্যের বিষয় আপনাদের কাছে বেশি কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কারণ আপনাদের সঙ্গে আমাদের মানসিক ঐক্যের প্রধান বন্ধনই ত এই ভাষার বন্ধন। ভাষাই হচ্ছে একটি জাতির পরস্পরের মনপ্রাণের অপৌরুষেয় যোগসূত্র। আমি অপৌরুষেয় বিশেষণটি ব্যবহার করছি এই কারণে যে, কোন বিশেষ ব্যক্তি কর্ত্তৃক পৃথিবীর কোন ভাষাই সৃষ্টি হয় নি, আমাদের ভাষাও হয় নি। একটা সমগ্র মানব-সমাজ যুগ যুগ ধরে অলক্ষিতে একটা ভাষা গড়ে তোলে। সামাজিক মন যে ভাবে দিনের পর দিন গড়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষাও গড়ে উঠেছে। একটা জাতির মন যে কারণে যে উপায়ে সাকার হয়ে উঠেছে, সে জাতির ভাষাও সেই কারণে সেই উপায়ে সাকার হয়ে উঠেছে। জাতির মন যখন একটি বিশিষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে, তখনই তা সাহিত্যে বিকশিত হয়। সাহিত্যে দীক্ষিত হয়েই ভাষা তার দ্বিজত্বলাভ করে, অর্থাৎ দ্বিজ হয়। সাহিত্যের মূল উপাদান কি?—মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, বেদনা, কল্পনা কামনার চিত্রই ত সাহিত্য। যখনই একটি জাতির ভিতর সাহিত্যের দর্শন লাভ করা যায়, তখনই বুঝতে হবে সে জাতির মন আলোকে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে, ও তার অন্তরে আত্মজ্ঞান প্রবুদ্ধ হয়েছে। কারণ সাহিত্য প্রবুদ্ধজ্ঞানেরই সৃষ্টি। মানুষের মন ও ভাষাকে দেশ ও কাল, দুজনে দু হাত মিলিয়ে তৈরী করেছে। আমরা যদি কোন

কারণে দেশের বন্ধন কাটাই, তাহলেও কালের বন্ধন ছিন্ন করতে পারি নে। মানুষ উদ্ভিদের মত জিওগ্রাফির অধীন নয়; তার মন নামক জিনিষ আছে বলে' সে মুখ্যত হিষ্টরির অধীন। সে অধীনতা পাশ সম্পূর্ণ ছিন্ন করলে সে পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। আমরা যাকে জাতীয়তা বলি, তার মূলভিত্তি ইতিহাসের গর্ভে নিহিত।

৯

রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্ব্বে এই বলে আক্ষেপ করেন যে,—"আমাদের দেশের পুরাবৃত্ত, ভাষাতত্ত্ব, লোক-বিবরণ প্রভৃতি সমস্তই এ পর্য্যন্ত বিদেশী পণ্ডিতেরা সংগ্রহ এবং আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। দেশে থাকিয়া দেশের বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমরা একেবারে উদাসীন, এমন লজ্জা আর নাই।" আপনারা শুনে সুখী হবেন, বাঙালীরা তাদের ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে এখন আর উদাসীন নয়। সম্প্রতি আমার বন্ধু শ্রীমান সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় —"The Origin and Development of the Bengalee Language" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেছেন। এই বিরাট গ্রন্থের মালমসলা সংগ্রহ করতে এবং সেই উপাদান দিয়ে এই ইতিহাস রচনা করতে, একযুগ ধরে তাঁকে কি একান্ত, কি অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে, তা ভাবতে গেলেও আমাদের মন অবসন্ন হয়ে পড়ে। এখানি ভাষাবিজ্ঞানের একখানি অতুলনীয় গ্রন্থ। বিজ্ঞানের একটা মস্ত গুণ এই যে, ও শাস্ত্র অনেক তর্কের একেবারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে দেয়। তার একটি চমৎকার প্রমাণ আমি বহুকাল পূর্ব্বে পাই। জনৈক ব্রাহ্মণপণ্ডিত একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, 'চৌধুরী মশায়, এ কথা কি সত্য যে ইউরোপের পণ্ডিতেরা সূর্য্যের পরিমাণ নির্ণয় করেছে?' আমি উত্তরে বললুম—'হাঁ, এ কথা আমিও শুনেছি।' এ উত্তর শুনে তিনি হেসে বল্লেন 'মূর্খের অসাধ্য কিছুই নেই, সূর্য্য যে প্রমেয় তাই প্রমাণ করবার আগে বেটারা সূর্য্যকে মেপে সারলে!' আমি মনে মনে বললুম, যখন তারা সূর্য্যকে মেপে সারা করেছে, তখন তা প্রমেয় কি অপ্রমেয় এ তর্কের আর অবসর নেই। তা ছাড়া সূর্য্য প্রমেয় কি অপ্রমেয় এই তর্কই যদি চালানো হত, তাহলে মাপ আর কখনই নেওয়া হত না; কেননা ও তর্কের আর 'শেষ নেই, যাবচ্চন্দ্র দিবাকর চলতে পারে।

আমরা পাঁচজন সাহিত্যিক মিলে যে ভাষার তর্ক করেছি, সে কতকটা ঐ গোছের। চলতি বাঙলা লিখিতব্য কি অলিখিতব্য, তাই নিয়ে আমরা বাক্‌বিতণ্ডায় ব্যাপৃত ছিলুম। শ্রীমান সুনীতি এ তর্ককে খতম করে দিয়েছেন। তিনি বঙ্গভাষায় যে পুরাতত্ত্ব আমাদের শুনিয়েছেন, তা আপনাদের সংক্ষেপে শোনাতে চাই। কারণ এ আশা আমি করতে পারি নে যে, ঐ দু' হাজার পাতার বই ধৈর্য্য ধরে আপনারা পড়ে উঠতে পারবেন। ওতে সব আছে। আমার সেই পুরোনো সমস্যা "স" কি করে "হ" হয়, তার সন্ধানও এ পুস্তকে পাওয়া যায়। কিন্তু ভয় নেই, সে সব কথা আপনাদের বলতে যাচ্ছি নে। আমি উক্ত গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক খোসা ছাড়িয়ে ও বীচি বেছে আপনাদের কাছে তার শাঁসটুকু শুধু ধরে দেব। আশা করি তা আপনাদের তাদৃশ মুখরোচক না হোক্, নিতান্ত কটুকষায় হবে না।

১০

সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে যাঁর চাক্ষুষ পরিচয় আছে, তিনিই লক্ষ্য করেছেন যে, ও নাটকের নায়ক-নায়িকা সকলেই সংস্কৃতে কথা কন্ না, স্ত্রী শূদ্রের ও ভাষায় অধিকার নেই। এর কারণ ও দেবভাষা আয়ত্ত করতে শাস্ত্রমার্গে ক্লেশ করতে হত। সে ক্লেশ যাঁরা করতে নারাজ ছিলেন, তাঁরা সে কালের প্রচলিত মৌখিক ভাষাতেই কথোপকথন করতেন। এ কালে স্ত্রী শূদ্রেরা যেমন ইংরেজী ভাষায় শুক্‌ তণ্ড না করে দেশ-ভাষাতেই কর্ত্তাবার্ত্তা কয়। তবে এ কালে যেমন জনকতক বিদুষী মহিলা ইংরেজী ভাষাকে মাতৃভাষা করে তুলেছেন, সে কালেও তেমনি জনকতক বিদুষী মহিলা সংস্কৃত ভাষাকে সমান কণ্ঠস্থ করেছিলেন। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকারা রঙ্গমঞ্চে আরোহণ করলে সংস্কৃত ছাড়া আর কিছু বলতেন না

মৌখিক ভাষা প্রাকৃতজনের মুখের ভাষা বলে তার নাম হয়েছিল প্রাকৃত।

এই প্রাকৃত মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসবামাত্র ব্যাকরণের অষ্ট বন্ধনে পড়ে গেল, এবং আলঙ্কারিকদের কল্পিত বিধিনিষেধের অধীন হয়ে পড়ল। নাটক-কাররা অলঙ্কারের বিধি অনুসারে গদ্য রচনা করতে বাধ্য হলেন শৌরসেনী প্রাকৃতে, আর পদ্য রচনা করতে বাধ্য হলেন মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে। শৌরসেনী প্রাকৃত ছিল, যে দেশে এখন আমরা উপস্থিত, সেই দেশের সে কালের ভাষা। তার মহারাষ্ট্র ত অদ্যাবধি স্বনাম রক্ষা করে এসেছে। গদ্য কেন শৌরসেনীর দখলে এল, আর পদ্য মহারাষ্ট্রীর?—সম্ভবত দিল্লী বক্তৃতার পীঠস্থান বলে, আর মহারাষ্ট্র গানের দেশ বলে। সে যাই হোক, এ দুই ছাড়া সংস্কৃত নাটকে আর একটি প্রাকৃতও আমাদের কর্ণগোচর হয়। চণ্ডাল, জল্লাদ, চোর, ধীবর প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের মুখে যে প্রাকৃত শোনা যায়, সে প্রাকৃতের নাম মাগধী প্রাকৃত। এই মাগধী প্রাকৃতই রূপান্তরিত হয়ে কালক্রমে বঙ্গভাষায় পরিণত হয়েছে। বঙ্গভাষার আর যে গুণই থাকুক, তার বংশ-মর্য্যাদা নেই। সে বড় ঘরের সন্তান নয়। আসলে খানদানি ভাষা হচ্ছে 'ব্রজভাখা', কেননা সে ভাষা শৌরসেনী প্রাকৃতের বংশধর। 'ব্রজভাখা' যে সাহিত্যে মাথা তুলতে পারে নি, সে বিদেশী ভাষার বাদশাহী চাপে।

১১

প্রাকৃত হচ্ছে মৌখিক ভাষার লিখিত সংস্করণ, অর্থাৎ মুখের ভাষা পুঁথিগত হলেই তা হয় প্রাকৃত। ও হচ্ছে সে কালের সাধুভাষা। ভাষা মানুষের মুখে মুখে বদলে যায়। চলতি ভাষার প্রধান গুণ অথবা দোষ এই যে, তা চলৎশক্তিরহিত নয়। অপর পক্ষে লিখিত ভাষা বাণীর গুরুপুরোহিতদের শাসনে বইয়ের মধ্যে জড়সড় ও আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকে। সমাজ বদলায়, মানুষের মন বদলায়। কিন্তু পুঁথিগত প্রাকৃতের আর বদল নেই। কিছুদিন পরে দেখা যায় যে, যে-প্রাকৃত এককালে মুখে মুখে চলত, সে প্রাকৃতও শাস্ত্রমার্গে ক্লেশ করে শিক্ষা করতে হয়।

মৌখিক প্রাকৃতের স্রোত কালের সঙ্গে বয়ে গিয়ে যখন নবরূপ ধারণ করে, তার নাম হয় তখন অপভ্রংশ। শৌরসেনী প্রাকৃত যেমন কালক্রমে শৌরসেনী অপভ্রংশে পরিণত হয়েছিল, মাগধী প্রাকৃতও তেমনি কালক্রমে মাগধী অপভ্রংশে পরিণত হয়েছিল।

মাগধী-প্রাকৃত অবলীলাক্রমে তার রূপ পরিবর্ত্তন করে, কেন না মাগধী-প্রাকৃত কস্মিনকালেও লিখিত ভাষা হয়ে ওঠে নি। কেতাবী ভাষার চাপে তার মুক্ত গতি কখনই রুদ্ধ হয় নি। বৌদ্ধধর্ম্ম অবশ্য মগধেই জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু বিপুল বৌদ্ধশাস্ত্র মাগধী ভাষায় লিখিত নয়। পালি বেহারী ভাষা নয়—মালবের ভাষা। জৈনধর্ম্মের জন্মস্থানও ঐ অঞ্চলেই। কিন্তু জৈনশাস্ত্র যে ভাষায় লিখিত হয়েছে, সে ভাষা মাগধী নয়—অর্দ্ধ-মাগধী। অর্থাৎ তা কাশী-কোশলের ভাষা, আজকাল আমরা যাকে আউধের ভাষা বলি। মাগধী-প্রাকৃত ও মাগধী-অপভ্রংশ যুগ যুগ ধরে সাহিত্যের পাশ কাটিয়ে গিয়েছে। ফলে বহুকাল ধরে তা দেহাতি বুলি ও জেনানাবুলি রূপেই বিরাজ করছিল; শেষটা বাঙলায় এসে তা সাহিত্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

[আগামী বারে সমাপ্য]

রমঁ্যা রলাঁ

[শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীমতী শান্তা দেবী অনূদিত]

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রভাত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মিন্না

এই সময়ে ক্রিস্তফ্‌দের ছোট শহরে একটি নূতন অতিথির আবির্ভাব হইল; ইনি বার্লিনের একটি সম্রান্ত বংশের মহিলা: জোসেফা। স্বামীর মৃত্যুর পর বার্লিন ছাড়িয়া রাইন্ নদীর ধারের এই শহরে আসিয়া বাসা বাঁধিলেন—সঙ্গে তার একটি কন্যা—মিন্না। মহিলাটির পিত্রালয় এই শহরে; এখানে একটি পুরাতন বাড়ী ও প্রকাণ্ড বাগান লইয়া তাঁরা থাকেন—নদীর ধার পর্য্যন্ত তাঁদের জমি বিস্তৃত—ক্রিস্তফের বাড়ীর খুব নিকটে। ক্রিস্তফ তার ছোট্ট জানালাটি হইতে দেখে বড় বড় গাছ প্রাচীরের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; শেওলা ঢাকা টালির ছাদের চূড়াও চোখে পড়ে। বাগানের পাশ দিয়া একটি সরু পথ গড়াইয়া গিয়াছে, তাহার উপর একটা থাম বা গাছ বাহিয়া উঠিলেই প্রাচীরের ভিতরের দৃশ্য চোখে পড়ে। ক্রিস্তফ্ সে সুযোগ ছাড়িত না; সে সুন্দর ঘাস মোড়া জমি ও পথ, বিরাট বৃক্ষলতার নীরব আলিঙ্গন, অদূরে শাদা বাড়ীর বহির্ভাগ এবং নির্ব্বোধ দরজাটার চাপা মুখ—সব মন দিয়া দেখিত। বছরে দু'একবার একজন মালী বাড়ীর দরজা জানালা খুলিত কিন্তু শীঘ্র আবার সব বন্ধ হইয়া যাইত—থাকিত শুধু প্রকৃতির নীরব প্রভাব ও স্তব্ধতা।

*   *   *   *

একদিন ক্রিস্তফ্ সেই পরিচিত পথটি বাহিয়া উঁচু স্থানটি হইতে তার অভ্যাস মত বাগানের ভিতর দিকে তাকাইল, অন্যমনস্ক ভাবে নানা জিনিষ দেখিয়া কত কথা ভাবিয়া সে যেমন নামিয়া পড়িবে এমন সময় কিছু একটা যেন তার নূতন ঠেকিল। সে বাড়ীটির দিকে তাকাইল। জানালা খোলা, সূর্য্যের আলো বাড়ীর

ভিতরটিতে প্রবেশ করিয়াছে; লোক জনের মুখ দেখা যায় না বটে, কিন্তু কেমন যেন বাড়ীটা তার পনেরো বছরের নিদ্রার পর জাগিয়া উঠিয়া হাস্যমুখরিত হইয়াছে! মনের মধ্যে বেশ একটু চঞ্চলতা লইয়া ক্রিস্তফ্ বাড়ী ফিরিল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় তার পিতা সে দিনের সব চেয়ে বড় খবরটার আলোচনা করিতেছিলেন; মাদাম জোসেফা এবং তাঁর কন্যা অসম্ভব রকম মালপত্রের বোঝা লইয়া শহরে আসিয়াছেন। এবং দেখিতে বাড়ীর সামনে বেশ ভিড় জমিয়াছে। খবরটা পাইয়া ক্রিস্তফের মন চঞ্চলতায় অধীর হইয়া উঠিল, সে কাজে গেল বটে কিন্তু সারাক্ষণ সেই মায়াপুরীর মানুষদের কল্পনায় বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল। কাজের মধ্যে ক্রমশ সবটা ভুলিয়া গেলেও বাড়ী ফিরিবার সময় হঠাৎ সজাগ হইয়া ঔৎসুক্য বশে সে তার পরিচিত উঁচু জায়গাটি হইতে গোপনে দেখিতে গেল, প্রাচীরের ওপাশে ব্যাপারটা কি? সে বিশেষ কিছুই দেখিল না, শুধু সেই নিস্তব্ধ পথের দুধারে শান্ত তরুশ্রেণী যেন শেষ রবিকিরণে ঘুমাইতেছে! ক্রিস্তফ্ ভুলিয়া গেল সে কেন এ দিকে দেখিতেছে—শুদ্ধতার মাধুর্য্য তাহাকে একেবারে পাইয়া বসিয়াছে। সেই অদ্ভুত জায়গায় একটা উঁচু খোঁটার উপর দাঁড়াইয়া সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে; অন্ধকার বদ্ধ নোংরা গলিটা পার হইয়া এই সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত উদ্যানটি দেখিতে যেন নন্দনকানন মনে হয়, তার সমস্ত প্রাণ এই স্নিগ্ধ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে যেন সঙ্গীত-মুখর হইয়া উঠিল; দেশ-কাল-বস্তু জগৎ সব সে ভুলিয়া গেল—কে যেন তাহাকে ঘুম পাড়াইতেছে—তার হৃদয়ের একটি স্পন্দনও সে অন্যমনস্ক হইয়া হারাইতে চায় না।

এমনি হাঁ করিয়া খোলা চোখে সে কতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিল তার মনে নাই—কি সে দেখিতেছে তাও ক্রিস্তফ্ জানে না! হঠাৎ তার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল; রাস্তার বাঁকে তার সামনে দাঁড়াইয়া দুটি নারী তার দিকে দেখিতেছেন; একজন বর্ষীয়সী তাঁর কালো পোষাক, সুন্দর চুল, সমুন্নত সুঠাম দেহ অথচ চালচলন যেন আলু থালু রকমের; তিনি সস্মিত সদয় দৃষ্টিতে ক্রিস্তফের দিকে চাহিয়া ছিলেন। অন্য মেয়েটির বয়স আন্দাজ পনেরো, পরণে শোকসূচক কৃষ্ণবেশ; সে এমন ভাবে দেখিতেছিল যেন সে বিদ্রূপহাস্যে ফাটিয়া পড়িবে; কিন্তু তার মা তাকে ইসারা করিয়া হাসি থামাইতে বলিলেন; মেয়েটি মুখে হাত দিল—যেন সে আর হাসি চাপিতে পারে না। তরুণীটির মুখখানি সুন্দর, গোলগাল, গোলাপী রঙ্, ছোট্ট নাক, একটু চওড়া মুখ, গোল চিবুক, সুস্পষ্ট ভ্রূরেখা, উজ্জ্বল চোখ, সমস্ত চুল খোঁপা করিয়া বাঁধা, তাহাতে তার সুঠাম কণ্ঠ ও মসৃণ ললাট যেন আরও স্পষ্ট হইয়াছে—একেবারে চক্রনাথের (Cranach-এর) চিত্র!

দেখিবামাত্র ক্রিস্তফ্ যেন পাথর হইয়া গেল; সে নড়িতে পারে না; তার পা যেন মাটিতে শিকড় গাড়িয়াছে—হাঁ করিয়া সে চাহিয়া আছে! মহিলাটি একটু সদয় বিদ্রূপ ভঙ্গীতে তার দিকে আসিতেই ক্রিস্তফ্ যেন বাঁধন ছিঁড়িয়া এক লাফে গলির মধ্যে পড়িল—তার সঙ্গে পাঁচিলের খানিকটা বালি খসিয়া আসিল! সে শুনিল, কে যেন স্নিগ্ধ কণ্ঠে একবার তাকে ডাকিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসির যেন ফোয়ারা ছুটিল, পাখীর গানের মত মিষ্ট স্পষ্ট আওয়াজ। সে তখন হুমড়ি খাইয়া গলির মধ্যে পড়িয়াছে; খানিক স্তব্ধ থাকিয়া সে একেবারে ছুট্ দিল, যেন কেউ তাহাকে তাড়া করিতে না পারে। সে কি লজ্জা! ঘরের মধ্যে আসিয়া একা দাঁড়াইতেই আবার সে লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। তার পর সে আর ঐ পথে যাইতে ভরসা করিত না, যদি কেউ, ওৎ পাতিয়া থাকে! ঐ বাড়ীর ধার দিয়া যাইতে হইলে সে দেয়াল ঘেঁসিয়া হাঁটে এবং মাথা গুঁজিয়া প্রায় ছুটিয়া চলে, কোন দিকে তাকায় না! অথচ সেই দুখানি মুখ সে কিছুতেই ভুলিতে পারে না; তার জানালার কাছে গিয়া সে জুতা খোলে এবং উপরের সার্সির ভিতর দিয়া সেই বাগান ও বাড়ীর দিকে তাকায়; যদিও সে বিলক্ষণ জানে যে, চিমনীর চূড়া ও গাছের ডগা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইবে না।

মাস খানেক পরে একদিন সাপ্তাহিক কন্সার্টে

ক্রিস্তফ্ তার নিজের রচনা কিছু আলাপ করিতেছিল; প্রায় যখন বাজান শেষ হইয়াছে হঠাৎ সে দেখিল, তার সাম্নের 'বক্স' হইতে সেই মহিলাটি ও তাঁর কন্যা তাকে দেখিতেছেন। এটা এমনই অপ্রত্যাশিত যে ক্রিস্তফ্ তার সঙ্গতের যন্ত্রীদের পরিচালন-সঙ্কেত দিতে প্রায় ভুলিয়া গেল; শেষ পর্য্যন্ত শুধু যেন কলের মত কোনরকমে সে হাত নাড়িয়া গেল। শেষ হইলে সে তাঁদের দিকে সে প্রকাশ্যে না চাহিয়াই বুঝিতে পারিল যে, মহিলা দুটি বেশ একটু জোরে হাততালি দিতেছেন যেন ক্রিস্তফ্কে জানাইবার জন্য। সে রঙ্গমঞ্চ হইতে সরিয়া গেল; বাহির হইবার পথে দেখে, মহিলাটি যেন তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁর দিকে না তাকাইয়া যাওয়া কঠিন; অথচ যেন সে দেখিতে পায় নাই এমনি ভাবে সে পাশের একটা দরজা দিয়া সরিয়া পড়িল। তখুনি সে নিজের উপর বিষম চটিয়া গেল। মহিলাটি ত তার কোন অনিষ্ট করিতে আসেন নাই; অথচ এটাও ঠিক, তেমন অবস্থায় পড়িলে সে আবার ঐ রকম ব্যবহার করিবে! পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হইবার ভয়ে সে অস্থির। তাঁর মতন কোন মানুষ দূর হইতে দেখিলে সে অন্য রাস্তা ধরিয়া পালায়!

—ক্রমশ

অশ্রুজল

(বায়রণ)

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

হাসির আড়ে বিষের-ছুরি থাক্‌তে পারে সর্ব্বদাই,—
চোখের জলে অন্তরালে প্রেম ছাড়া আর কিচ্ছু নাই;
অশ্রু ধোয়া প্রেমের মালা কণ্ঠে পরার আগ্রহে,
সৈন্য বলে 'যুদ্ধে গিয়ে মৃত্যু বরণ করব হে,—'
রণ্-বিজয়ী ক্লান্ত হিয়ায় প্রিয়ার কাছে যায় যখন,
চুম্বনে সে হ্যায় মুছে তার তপ্ত আঁখির জল তখন;
দরদ্-ভরা প্রিয়ার আঁখির প্রেম-মাখানো অশ্রুজল,
হাল্কা করে ক্ষতের ব্যথা, হ্যায় জুড়িয়ে মর্ম্মতল।

* *

সঙ্গোপনে বলছে কবি 'হে মুসাফির যাত্রীদল,—
আমার চিতা পড়্‌লে পথে একটু ফেলো অশ্রুজল।'

লিওনিদ্ আন্দ্রিভ্

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

১

প্রত্যেক যুগের সাহিত্যের পিছনে অনন্ত শক্তি ও প্রেরণার উৎস-স্বরূপে রয়েছে—রস-স্বরূপ মানুষ। এই মানুষের কোনও লৌকিক সংজ্ঞা নেই। বস্তুর অতীত রস যেমন বস্তুকে অতিক্রম করেও বর্ত্তমান থাকে—সেই রকম এই রসস্বরূপ মানুষ বিভিন্ন যুগের বিবর্ত্তনের অতীত হয়ে সমস্ত মানবতাকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। বিভিন্ন যুগের কবি বিভিন্ন ভাবে এর সংজ্ঞা ও পরিচয় দিয়েছে। আর আমরা আমাদের সুবিধা মত বাইরের প্রয়োজনের অনুযায়ী তাদের Classics, বা Romantist, বা Realist, বা Mystic বলেছি এবং এই মন-গড়া ভাগাভাগি নিয়ে তুমুল তর্ক ও বিবাদের সৃষ্টি করেছি।

সাহিত্যের যেমন একটা লোকোত্তর দিক আছে—যেখানে সে বস্তু ও কালকে অতিক্রম করে অনন্তের ক্রীড়া-সহচর হয়; তেমনি তার একটা লৌকিক রূপও আছে—যা বস্তু ও কালের পরিমাপ ও পরিভাষাকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে না। আমরা সাহিত্যের যে ভাগাভাগির সৃষ্টি করেছি তার মূলে রয়েছে সাহিত্যের শেষোক্ত দিকটার প্রতি আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টি। একদিন মানুষ প্রতিদিনের জীবনে দেবতার সাক্ষাৎ-যোগ অনুভব করত, তার দৃষ্টির সম্মুখে তার দেবতা মূর্ত্তিতে বিকশিত হয়ে উঠত, তাই সেদিন সে যে গান রচনা করেছিল—তাতে মর্ত্ত্যের চেয়ে স্বর্গের দাবী ছিল বেশী। কিন্তু তবুও তার মাঝখানে দেখি—এই যে এত আয়োজন, এত দেবতার নিত্য নব-আবির্ভাব—এ শুধু মানুষেরই বিকাশের প্রয়োজনে। যে কারণে একদিন বাল্মীকি, হোমার, ভার্জ্জিল, দান্তে মানুষের কাহিনীর মধ্যে দেবতার আবির্ভাব ও অলৌকিক ঘটনার ঘন অস্তিত্বের একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন—সেই একই কারণে বিংশ শতাব্দীর কবিগণ মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় গ্রন্থীর সমাবেশ করেছেন। আজ স্বর্গকামী মানব-বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের জন্য মেনকার আবির্ভাবের প্রয়োজন নেই; তার তপোভঙ্গের প্রতিবন্ধক তার আপনার অন্তরেই আছে, তার আপনার দেহের প্রতিবেশী। প্রাচীন কবি কালধর্ম্মবশত যে জিনিষকে ফোটাতে বাহিরের রূপকের আশ্রয় নিয়েছিলেন, এ যুগের কবি সেই একই কালধর্ম্মের অনুযায়ী রূপকাতীত মনস্তত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তাই সে যুগের সাহিত্যে মানুষকে ছাপিয়ে স্বর্গ ও দেবতার মূর্ত্তি পরিস্ফুট হয়েছিল; আর তাই এ যুগের সাহিত্যে স্বর্গ ও দেবতাকে আত্মস্থ করে মনোময় মানুষই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আমরা প্রাচীন যুগের সাহিত্যকে বলি Classics—আর আজকালকার সাহিত্যকে বলি realistic! অনেকে আবার তর্ক করি এই ভাগাভাগির শ্রেষ্ঠতার সম্পর্কে!

বস্তুর তীরে বসে আমরা যখন পরিমাপ নিয়ে কলহ করি তখন বস্তুর অন্তর্নিহিত রস-সমুদ্রে পূর্ণচন্দ্র বিদ্রূপের হাসি হাসে! অণুর অন্তরে অনন্ত হাসে!

২

বিংশ-শতাব্দীর সাহিত্য আমাদের কাছে এক অপরূপ সুষমায় ফুটে উঠেছে। বাঙলার নারিকেলকুঞ্জে আজ যে

ধ্বনি মন্ত্রিত হচ্ছে সেই একই ধ্বনি আজ শুনি সাতসমুদ্র তেরো-নদীপারের দেশেও বাজে। এমন পরিব্যাপ্ত ভাবে এক মহা-সাহিত্য মনে হয় আর কোনও কালে প্রসার লাভ করে নি। আর, কোনও কালে বোধ হয় সাহিত্যের মঙ্গল-অস্তিত্বের এত বেশী প্রয়োজনীয়তাও ছিল না। শতাব্দীর অনাচারে ও দেশাচারের অত্যাচারে এবং লোভে আজ সমগ্র পৃথিবী এক অশান্ত খণ্ডিত মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করেছে। লোভে, স্বার্থে, মোহে আজ মানুষের ইতিকথা কলঙ্কিত হয়ে উঠেছে। এই খণ্ডিত পৃথিবীর উপরে এক অভিনব সাহিত্যলোকের সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে—যেখানে পরিপূর্ণরূপে অখণ্ড মঙ্গল বিরাজ করছে। ফ্রান্সের রাজপথে পথে যখন মানুষ জাতি-প্রেমের কর্ত্তব্যে উন্মাদ হয়ে La Marsaille-এর তালে জনতার ধর্ম্মের মধ্যে ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়েছিল, তখন আর একজন দুঃখব্রতী ফরাসী কবির উদাত্ত স্বরে এ কথা প্রচার করা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল যে, "My theme is that the individual soul has been swallowed up and submerged in the soul of the multitude ; and in my opinion such an event is of far greater importance to the future of the race than the passing supremacy of a nation." (১) বস্তুর আধিপত্যে যখন মানুষ অন্তরের কল্যাণ অস্তিত্বের কথা ভুলে যেতে বসেছে তখন Peer Holm-এর সৃষ্টির সার্থকতার একান্ত প্রয়োজনীয়তা ছিল। য়ুরোপের নবতান্ত্রিক Pharisis ও Saducise-দের মাঝখানে আবার নূতন করে Palestine-এর সেই শান্ত মেষপালকের অন্তর্গূঢ় মুর্ত্তিকে বিকশিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা থেকেই Peer Holm-এর সৃষ্টি! ব্যবহারিক জগৎ যখন মানুষের মূল্য দিতে বসেছিল শুধু তার পরিশ্রম করবার ক্ষমতার বিচার করে, এবং তার ফলে মানুষকে সে কল ও কব্জার অঙ্গীভূত করে নিয়েছিল তখন জগতের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় ছিল কতকগুলি ঘরছাড়া যাযাবর প্রাণের সৃষ্টি ; যারা কলঙ্কের মসীপঙ্কে থেকেও শেষে উক্তি করে গেছে, "Though dying every moment, we are more immortal than the gods" (২) যে যুগে মানুষ স্বভাবত আপাতসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে, আপনার ভোগ-বিলাসের অচলায়তনের সৃষ্টি করে মুক্তির নামে আপনাকেই শুধু বন্দী করে চলেছে—সে যুগে দেশ ও কালের উপযোগিতাকে অতিক্রম করে সেই রহস্যময় সুরেরই একান্ত প্রয়োজন ছিল যা জীবনের প্রতি কক্ষে অনন্তের বিরহের সুতীব্র জ্বালা লাগিয়ে দিল—যে সুরের আগুনে মনের পাঁচিল পুড়ে ছাই হয়ে পড়ে গেল, চোখের সামনে ফুটে উঠল—অসীম আকাশ, অনন্তের রঙ্গ ভূমি!

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য আমাদের কাছে তাই শুধু "কতকগুলি বিদেশী নামের ফিরিস্তি নয়" ; এই মানবতার যৌবন স্বপ্নে বাঙালীর তরুণ মন যে দুলে উঠেছে—এ তার গর্ব্বের বিষয়। আজ এই শীত-পাংশু সন্ধ্যার আকাশে, বিংশ শতাব্দীর কোনও এক দিনে, গঙ্গার কূলে নিষ্প্রভ চন্দ্রালোকে অগণিত জন-কলরবের মাঝখানে বিংশ-শতাব্দীর সাহিত্যের অন্তর-লক্ষ্মীকে বন্দনা করি—এই দুঃখদৈন্যপরাধীনতায়-অবশ মনে, হে সুরলক্ষ্মী, তুমিই মানবতার বিরাটরূপ নানাভাবে আমার অন্তরে বিকশিত করেছ! হে সুরলক্ষ্মী, হে শতাব্দীর সাহিত্য, আমি তোমারই সন্তান, তোমার গৌরবের যেন উত্তরাধিকারী হই।

৩

মহাসমুদ্রের ও-পারে ক্রোড়পতিদের দেশে এক মহাকবি জন্মগ্রহণ করেন। বিংশ শতাব্দীর অপরূপ মূর্ত্তি তিনি সমগ্রভাবে কল্পনা করেছিলেন। যখন যন্ত্র আর হৃদয়ের সামঞ্জস্য না রাখতে পেরে—মানুষ, কেউ বা নিন্দায় কেউ বা প্রশংসায়, আত্মপ্রসাদ লাভ করছিল, তখন আমেরিকার তটভূমি থেকে এক উদাত্ত বাণী জাগ্রত হয়ে পুরুষ-কণ্ঠে প্রচার করল—জয়, জয়, এই শতাব্দীর জয়!

(১) Clerambault—Romain Rolland.

(২) The Wall—Leonid Andriev.

যন্ত্র জয়যুক্ত হোক, মর্ম্ম জয়যুক্ত হোক্। মিলিত মহা-মানবতা জাগে!

তিনি প্রচার করলেন, 'ইহা কলি-যুগ, সকল যুগ-সার'—পাপে পুণ্যেও সহস্র অসামঞ্জস্যে-ভরা এই নূতন মানুষের দল—আপনাদের অস্তিত্বের তেজে স্বর্গকে পরাভূত করবে; কর্ম্মের ও সৃষ্টির নব নব আনন্দে মানুষ, তার ক্ষুদ্রতাকে ছাড়িয়ে উঠবে। তিনি বিংশ-শতাব্দীর শিশু, এই নূতন মানুষের জয়গান রচনা করে গেলেন।—

"Of Life immense in passion, pulse, and power,

Cheerful, for freest action formed under the laws divine,

The Modern Man I sing *"

ওয়াল্‌ট্ হুইট্‌ম্যান-এর এই নূতন-মানবের দল সৃষ্টির গৌরবে ও আপনাদের প্রাণের তেজে আপনি সম্পূর্ণ। ওয়াল্‌ট্ হুইট্‌ম্যান-এর কবিতা বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন-মূর্ত্তি। কিন্তু মধ্যাহ্নের রবি-রশ্মি যত প্রখর হয়—দূর দিগন্তরে ছায়ার সম্ভাবনা তত সুদৃঢ় হয়ে উঠে। আবার সন্ধ্যা আসে, স্বপ্ন আসে, সঙ্গে আসে আবার সেই পুরাতন নিশীথমায়া-মরীচিকা। আকাশে আবার তারায় তারায় কি ইঙ্গিত ফুটে উঠে, বোঝা যায় না; নিশীথ-বায়ু কি আশ্রয় খোঁজে, বাণী পরিস্ফুট হয় না; অসীম আকাশের তলে অন্ধকারের দোলায় মন আবার দুলে উঠে। বিংশশতাব্দীর নিশীথ-রাত্রে মানুষ আপনার অপার নিঃসঙ্গতা অনুভব করে। অন্তরে তার আবার সেই আদিম প্রশ্ন সহস্র ফণা বিস্তার করে উঠে—কোথায়? কেন? কে?

কে বলে দেবে জীবনের চরম সার্থকতার কথা? কে বলে দেবে কেন এত ব্যবধান? কে শোনাবে আত্মার রহস্যের বাণী? কে দূর করে দেবে বাহিরের ও ভিতরের এত দ্বন্দ্ব? সকল-পাওয়ার নিবৃত্তি কোথায়? কোথায় মানুষের কামনার কল্পতরু?

নিশীথের কম্পিত দীপশিখা আকুলভাবে চেয়ে রয় আকাশের একাদশীর দিকে! হায় দীপশিখা!

বিংশ-শতাব্দীর নূতন মানুষের অন্তরের এই সন্দেহ-আকুল দিক—লিওনিদ্ আন্‌দ্রিভের সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব-রূপ পরিগ্রহণ করেছে!

আন্‌দ্রিভের সাহিত্যের কথা মনে হলেই মনে একটী ছবি রেখাহীন রূপ নিয়ে ফুটে উঠে। নিশীথরাত্রি! যতদূর দৃষ্টি যায়—শুধু নিঃসঙ্গ আর্দ্র অন্ধকার, উপরে একটী তারা; আর সেই নিঃসঙ্গ নিশীথে মাটীর বুকে ভীত-কম্পিত পা মেলে একটী মাতৃহারা মানব-শিশু চলেছে; সে কাঁদে, আর আকাশের দিকে চায়! তার বিরহের ক্রন্দনে আকাশের মাতৃ-রূপ ফুটে উঠে।

প্রত্যেক মানুষের মনে সে শিশু আজও চলেছে; তার কম্পিত পদধ্বনি আজও প্রাণে বাজে!

আন্‌দ্রিভ সেই ধ্বনিকে ব্যক্ত করেছেন; আপনার হৃদ্-স্পন্দনকে দেখবার জন্যে মর্ম্মস্থল থেকে ছিন্ন করে অক্ষরের শিলাভূমিতে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে আপনাকে অমর করে রেখে গেছেন।

৪

১৮৭১ খৃঃ অঃ Orel নগরে রুষদেশে লিওনিদ্ আন্‌দ্রিভ জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় তিনি যাকে বলে রীতিমত দুষ্টু ছেলে, তাই ছিলেন। পরের বাগানে আপেল চুরী করা থেকে, পাড়ার ছেলের মাথা-ফাটান পর্য্যন্ত সমস্ত গুণ ছেলেটীর মধ্যে ছিল। শীতকালে নদীতে বরফ জমে থাকত—তার উপর রাতদিন স্কেটীং চলেছে; অনেক বার পায়ের তলায় বরফ গলে টান ধরেছে, ছেলের হুঁস্-ই নেই। এই সমস্ত দুষ্টুমীর মধ্যে মাঝে মাঝে ছেলেটী দল ছেড়ে একলা চুপ করে বসে থাকতো। আন্‌দ্রিভের মা'র মতে ছয় বছর বয়স থেকেই আন্‌দ্রিভের থিয়েটারের দিকে ভয়ানক ঝোঁক পড়ে। মাঝে মাঝে পাড়ার ছেলেদের নিয়ে কারুর বাগানে—মস্কো আর্ট থিয়েটারের

* Leaves of Grass—Walt Whitman.

ভবিষ্যৎ নাট্যকার—খেলা-ঘরের ষ্টেজ তৈরী করে অভিনয় করতো। আন্‌দ্রিভের আত্মকাহিনী থেকে জানা যায় যে, সাতবছর বয়সেই ছেলেটী সেইখানকার লাইব্রেরীর একজন সভ্য হয়ে রীতিমত বই পড়া আরম্ভ করে দিয়েছেন।

আন্‌দ্রিভের শৈশবের আর একটা দিকের ছবির কথা স্মরণ হলে My Friend's Book-এর * শৈশবের চিত্র এবং জীবন-স্মৃতির স্কুলবালক রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে। স্কুলের গরাদের আর ঘরের পাঁচিলের ভিতর বন্দী শিশুর মন চায় পাখীর মত উড়ে যেতে—জোড়াসাঁকোর প্রাসাদের উপর থেকে একটী শিশুর মনে যে পথের ডাক হাতছানি দিত সে ইঙ্গিত আজ শৈশবের প্রাঙ্গণ এড়িয়ে—প্রকৃতির সেই শিশু-ভোলানাথকে প্রাচীর-হীন দূর-দূরান্তরে হাত ধরে নিয়ে চলেছে। কিন্তু এই সমস্ত মহাপুরুষদের শৈশবের বন্দী-দশার কাহিনীর মধ্য দিয়ে একটী জিনিষ মনে এসে বড় লাগে—সে, পৃথিবীর অজ্ঞাতনামা শত সহস্র শিশু ভোলানাথের বন্দী-দশা। শৈশব থেকে কৈশোরের আনাগোনার পথে প্রতি শিশু বাইরের চাপে এত জিনিষ হারিয়ে ফেলে—যার ফলে যৌবন তার অর্থশূন্য বয়সের বোঝামাত্র হয়ে উঠে।

শৈশব থেকেই আন্‌দ্রিভের মনে প্রাচীরহীন দিগন্তরের ডাক এসে পড়ে। কিন্তু আন্‌দ্রিভের জীবন যত অগ্রসর হয় তত প্রাচীরের পর প্রাচীর মাথা তুলে উঠে। জীবনের চারিদিকে প্রাচীরের প্রকাণ্ড ব্যবধান। এই প্রাচীরের প্রতীক তাঁর মনে এত পেয়ে বসে যে, তাঁর ভবিষ্যৎ লেখায় বহুস্থলে এর আবির্ভাব হয়। Anathema-য় দেখি, মানুষের প্রবুদ্ধ চেতনার প্রতীক রহস্যলোকের নির্ম্মম শিলাগাত্রে বারেবারে প্রহত হয়ে ফিরে আসছে। এবং পরে এই ব্যবধানের কাহিনী নিয়েই তিনি "The Walls" লেখেন।

আন্‌দ্রিভের ভবিষ্যৎ জীবনে দেখা যায় যে, বারে বারে কোলাহলময় নগর ছেড়ে ভীত ও আহত শশকের মত তিনি জনহীন প্রকৃতির গহন বুকে মমতাময় আশ্রয়ের খোঁজে ছুটেছেন। পরে রুষিয়া ছেড়ে সত্যসত্যই তিনি জনহীন Finland-এ এক পরিত্যক্ত "Castle"-এ জীবন অতিবাহিত করেন।

শৈশবে স্কুলের ধরা-বাঁধার মধ্যে বালকের মন তিক্ত হয়ে উঠত। ক্লাসের পড়াশোনা একদম হত না। তাঁর আত্মকাহিনী থেকে জানা যায় যে, তার ফলে প্রায়ই স্কুলের বারান্দার এক অন্ধকার নির্জ্জন কোণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে দাঁড়িয়ে শাস্তি ভোগ করতে হত। এই ঘটনার উল্লেখে তিনি বলছেন,—

"সেই জনহীন সুদীর্ঘ বারান্দায় মথিত-শব্দময় এক অপূর্ব্ব নিঃশব্দতা বিরাজ করত। মাঝে মাঝে দূরে পায়ের শব্দ হত। বারান্দার দু'ধারে দরজা-বন্ধ করে ক্লাস হচ্ছে। ক্লাস-ভরা ছেলে। উপরের ভাঙ্গা দেয়ালের এক ফাঁক দিয়ে একটী পথ-ভোলা সূর্য্যের কিরণ পায়ের কাছে ধূলোর উপর এসে পড়ত। আমার কাছে এই সমস্ত কেমন অপূর্ব্ব রহস্যময় লাগত, শাস্তি আমার সুন্দর হয়ে উঠত; ভাঙ্গা ফাটলের দিকে চেয়ে মনের মধ্যে কি ব্যাকুলতা স্তব্ধ হয়ে থাকত . . ."

বালক আন্‌দ্রিভ যখন শৈশব-কল্পনায় উদাসীন, তখন এমন একটী ঘটনা ঘটে যার ফলে জীবনের নির্ম্মম বাস্তবতার সঙ্গে তাঁর জীবন একেবারে একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেল। আন্‌দ্রিভের পিতা সহসা সমস্ত পরিবারকে একেবারে পথের ভিখারী করে চলে গেলেন।

কোনও রকমে আন্‌দ্রিভ স্কুলের পড়া সাঙ্গ করে আইন অধ্যয়নের জন্যে পেট্রোগার্ড-এ আসেন। এই সময় তাঁকে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। অনশন অভ্যাসের মত হয়ে উঠল; অথচ অভিমানী যুবা দাক্ষিণ্যের দ্বারেও হাত পাততে পারে না। আন্‌দ্রিভের আত্মজীবনীতে এই সময়ের ঘটনার উল্লেখে আছে, "সেই সময় আমি প্রথম গল্প লিখি। একটী ক্ষুধার্ত্ত ছাত্রের কাহিনী নিয়ে আমি আমার প্রথম গল্প রচনা করি। যতক্ষণ আমি গল্পটী

* My Friend's Book—Anatole France

লিখেছি, ততক্ষণ অবিশ্রান্ত কেঁদেছি। একদিন সন্ধ্যাবেলা গল্পটী হাতে নিয়ে এক খবরের কাগজের সম্পাদকের নিকট উপস্থিত হই। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কয়েক মিনিট পরে সম্পাদক হেসে গল্পটী আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর ক্ষুধার তাড়নায় কতবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছি—মাসিক-পত্রিকার অফিসের চৌকাঠ থেকেই ফিরে এসেছি।"

এই সময় আন্‌দ্রিভ্‌ প্রথমবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে কৃতকার্য্য হন নি বরং তার ফলে যাবজ্জীবন হৃদ্‌-রোগে কষ্ট পান। জীবনে তিনি তিনবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। আন্‌দ্রিভের আত্মজীবনীতে এই সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে, "টলষ্টয়ের What is my Faith পড়ে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। তন্ন তন্ন করে তার প্রতিটী অক্ষর বারবার পড়লাম। কিন্তু টলষ্টয়ের মতের সঙ্গে মিলাতে পারলাম না। রুষিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষের বাণীর একটী দিক মর্ম্মস্পর্শ করল—আর একটী দিকের সঙ্গে কিছুতেই মনের মিল ঘটাতে পারলাম না। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস্—জীবনকে ঈশ্বরের মঙ্গল অস্তিত্বের অনুযায়ী পরিপূর্ণ করে তোলা—বুঝলাম না। বুঝলাম—তাঁর মর্ম্মছেঁড়া বেদনার চীৎকার। এই অভিশপ্ত জীবনের কি প্রয়োজন? তারপর একদিন এক মে মাসের রাত্রিতে বহু লোক মিলে উন্মাদ উৎসবে মত্ত ছিলাম। ফিরবার পথে রেল-লাইন্ পড়ে। উৎসবান্তে তারা সব এগিয়ে চলেছে—গানে, আর আনন্দ কাকলীতে সে নিঃশব্দ প্রদেশ মুখর হয়ে উঠেছে। সবার পিছনে থেকে আমি ভাবি—এই সঙ্গীত—এই কাকলী—জীবনের শূন্যতাকে লুকিয়ে রাখবার এ কি ব্যর্থ প্রয়াস! ... হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে ট্রেণ আসবার তো সময় হয়েছে ... লাইনের উপর শুয়ে রইলাম ... যদি বাঁচি তাহলে নিশ্চয়ই বাঁচবার কোনও মানে আছে, মরি, ভবিতব্যতা ... সংজ্ঞা যখন হল তখন হাঁসপাতালে, মাথা আর বুকের যন্ত্রণায় সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠ্‌ল ... আমার বয়স তখন ষোল ..."

৫

আন্‌দ্রিভের প্রথম গল্প Bargomot and Garaska প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর সাঁইত্রিশ বছর বয়সে। এর আগে তিনি আদালতের রিপোর্টারের কাজ করতেন। তখন গর্কীর প্রতিভা পরিপূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়ে উঠেছে; গর্কীর নাম তখন দেশে দেশান্তরে (১৯০৮) ছড়িয়ে পড়েছে। গর্কীর সম্পাদিত কাগজে আন্‌দ্রিভের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। এই গল্পটীর মধ্য দিয়ে রুষ-সাহিত্যের এক-যুগের সর্ব্বশেষ দুই সাহিত্য-রথীর অপূর্ব্ব বন্ধুত্ব ঘটে। এবং এই বন্ধুত্বের জন্য আন্‌দ্রিভ সারাজীবন গর্কীর নিকট অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গেছেন; কারণ গর্কীই আন্‌দ্রিভের সুপ্ত প্রতিভাকে মাতৃ-স্নেহে বিকশিত করে তুলেন। যদিও পরে বোলশেভিজিমের উত্থানের ফলে এই দুই জনের মধ্যে ভীষণ মতদ্বৈধতা জন্মায় এবং দুই বিভিন্ন দল থেকে এই দুই প্রতিনিধি মসী যুদ্ধে রত হন—তবুও এই বন্ধুত্বের ব্যক্তিগত দিক অক্ষুণ্ণই ছিল।

১৯০১ সালে আন্‌দ্রিভ প্রথমে তাঁর ছোট গল্পগুলি একত্রিত করে একখানি বই প্রকাশ করেন। এবং এই গল্পগুচ্ছগুলিই একদিনে তাঁকে সমস্ত রুষিয়ায় সকলের সঙ্গে পরিচিত করে দিল। আন্‌দ্রিভের প্রতিভা বিকশিত হয় তাঁর যৌবনের শেষে; কিন্তু বিকশিত হয়েই সে তার অতুল সৌরভে সমস্ত দেশকে মগ্ন করে। টল্‌ষ্টয়, টুর্গেনিভ, গর্কীর সঙ্গে আন্‌দ্রিভের নাম উচ্চারিত হল। এমন কি Tsar Hunger-এর আঠারো হাজার বই-এর একটী সংস্করণ একদিনেই বিক্রী হয়ে যায়।

৬

মস্কো শহরে তখন 'Wednesdays' বলে এক সাহিত্য সভা ছিল। প্রতি বুধবার তার অধিবেশন হত। এই সভায় গর্কী, শেখভ, বুনিন, কবি বাল্‌মণ্ট প্রভৃতি রুষিয়ার তদানীন্তন অনেক রুষ-সাহিত্যিক যোগদান করতেন। এখানে প্রত্যেক বুধবার কেউ না কেউ তাঁর রচনা পাঠ করতেন এবং তারপর সেই রচনা সম্বন্ধে সভার মধ্যেই স্পষ্ট আলোচনা চলত। এই সভায় আন্‌দ্রিভ্‌ও যোগদান

করেন। এবং তাঁর বহু গল্প প্রথম এই সভাতেই পঠিত হয়।

আন্‌দ্রিভের জীবনের ট্র্যাজেডি এইখান থেকেই শুরু হয়। ১৯০৫ সালের ২২শে জানুয়ারী রুষিয়ার বাইরের রূপ বদলাতে লাগে। জারের সিংহাসন টলে উঠে; উন্মাদ ক্ষুধার্ত্ত জনসাধারণ ক্ষমতার সম্ভাবনায় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে। জনতার এই ভয়ানক উন্মাদ মূর্ত্তি আন্‌দ্রিভের মনে সন্দেহের রেখাপাত আনে। "বুধবার"-এর সমস্ত সভ্যই মার্কস্-পন্থী এবং জনতার পক্ষপাতী। হয়, আন্‌দ্রিভকে নিজের মনের সন্দেহ ও বিদ্রোহকে চেপে, সকলের সঙ্গে যোগ দিতে হয়—না হয় জীবনের সমস্ত মায়া পরিত্যাগ করে তারস্বরে প্রতিবাদ করতে হয়। যে বিশ্বাস ও সরলতার বলে গর্কী সন্দেহকে এড়িয়ে অসীম কর্ম্মের মধ্যে আত্মনিয়োগ করলেন—জীবনের প্রতি সে বিশ্বাস ও জনতার প্রতি সে শ্রদ্ধা আন্‌দ্রিভের ছিল না। Neitzche র Superman-এর মত আন্‌দ্রিভের মনে জনতার প্রতি একটা বিরূপ ভাব ছিল। দেশের চারিদিকে তখন ভয় আর ভাবনা, জীবনের চারিদিকে যেন এক নিগূঢ় রহস্যের ঘন-যবনিকা এসে পড়েছে। সত্যি, মিথ্যা, সুনীতি, দুর্নীতির ভেদ-রেখা লুপ্ত হয়ে আসছে। অসীম দ্বন্দ্বে দেশের অন্তর আলোড়িত হয়ে উঠল। লৌকিক দিক থেকে আন্‌দ্রিভের সাহিত্য তখনকার রুষ-মনের ভিতর ও বাহিরের এই দ্বন্দ্বের ছবি! কিন্তু রুষ-সাহিত্যিক কাল ও দেশকে স্বীকার করে' অপূর্ব্ব কলাকৌশলে কাল ও দেশ উভয়কেই অতিক্রম করে এক লোকোত্তর রূপ পরিগ্রহণ করেন!

আন্‌দ্রিভ জীবনের চারিদিক থেকে ব্যাহত হয়ে ক্রমশ আপনার মনের মধ্যে ফিরে আসেন। বোলশেভিক রুষিয়া থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে দূর ফিনল্যাণ্ডে আন্‌দ্রিভ বসবাস করেন। আন্‌দ্রিভের শেষজীবন জনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচার করতেই রত থাকে। একদিক থেকে গর্কী pamphlet লিখছেন, অন্যদিক থেকে আন্‌দ্রিভ তার উত্তর দিচ্ছেন। এ থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে, আন্‌দ্রিভ রুষিয়াকে ভালবাসতেন না। তার চেয়ে মিথ্যা কিছু আর হতে পারে না। প্রত্যেক রুষ-সাহিত্যিক রুষিয়াকে আপনার রক্ত দিয়ে বন্দনা করে গেছেন; কিন্তু সে বন্দনার ছন্দ বিভিন্ন—এই যা।

আন্‌দ্রিভের মন এত কোমল ও সংসার-অনভিজ্ঞ ছিল যে, কোনও দিন সে কোনও একটা ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারে নি। জীবনের শেষ দিকে তিনি রুষিয়ার সাহায্যের জন্য আমেরিকায় যাবার সঙ্কল্প করেন। সেই প্রসঙ্গে বিখ্যাত শিল্পী Nicholas Roerich-কে এক পত্রে লেখেন যে, "Ah, only now I see to what extent I am childlessly helpless in life, Yet to-day is my birthday: Forty-eight years I have been walking on the earth, and have so little adapted myself to its ways.

এই চিঠি লেখার কয়েক দিন পরে আন্‌দ্রিভ্ তাঁর শেষ চিঠি লেখেন। "আজ আমার একান্ত দুঃখ যে—আজ আমি গৃহহীন . . . ফিন্‌ল্যাণ্ডে আমার ছোট্ট ঘরখানি ছেড়ে চলে এসেছি . . . তার পরে আমার আরও বিশাল এক গৃহ ছিল—সে আমার রুষিয়া . . . তার চেয়েও উদার, বিরাট এক ঘর ছিল—সে আমার সৃষ্টি, আমার কাব্য! আজ আমি গীতহীন . . . গৃহহারা . . ."

দু'দিন পরে আট-চল্লিশ বছর বয়সে (১৯১৯) আন্‌দ্রিভ্ মারা যান। জীবনের অধিকাংশই নির্ব্বাসনে কাটে; তেলের অভাবে রাত্রে বাতি জ্বলে নি ঘরে; এমন কি রুষিয়ার অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক—তাঁর মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পয়সাও রেখে যেতে পারেন নি।

৭

আন্‌দ্রিভের সাহিত্য বিংশ-শতাব্দীর নিশীথ-স্বপ্ন। গৌরবের ও কর্ম্মশক্তির শীর্ষ-স্থানে এসে, এ যেন আবার প্রত্যাবর্ত্তন। যন্ত্রের অধিরাজ দেখে সে যাকে দেবতা বলে অর্ঘ্য দিয়ে এসেছে—সে মিথ্যা; সে শুধু অর্ঘ্যই নিয়েছে। মনের গুহায় হিরণ্ময়পাত্রে সত্যের সুধা এখনও যে অনাস্বাদিত রইল! আকাশের যবনিকা তেমনই সুনীল

রহস্যে আবৃত রইল ; তেমনি মানুষের মন সীমার প্রাচীরে বন্দী হয়ে রইল।

"জীবনের চারিদিকে অলঙ্ঘ্য প্রাচীর। প্রাচীরের ও'ারে সব-জানার দেশ। প্রাচীরের এ-ধারে অসম্পূর্ণ জীবনের ভার নিয়ে মানুষ চলেছে হঠাৎ জন্ম থেকে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু পর্য্যন্ত। এ-পারের মানুষ শুনেছে প্রাচীরের ও-পারে আছে—জীবনের সমস্ত সম্পূর্ণতা। মাঝে অমোঘ শত্রুর মত প্রাচীর দাঁড়িয়ে। কত লোক ব্যর্থ চেষ্টা করল তার উপরে উঠতে। একজন কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত লোক এই সমস্ত হতাশ লোকদের দেখে বিদ্রূপ করে বলে, হায় রে, মূর্খের দল, . . . তারা ভাবে পাঁচিলের ও-পারে বুঝি আলো আছে . . . সেখানেও এমনি অন্ধকার . . . এমনি অন্ধকারে সেখানেও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত রোগী মরণ ভিক্ষা করে পথে পথে চলেছে . . .

"তবুও চেষ্টার অন্ত নেই। একবার অগণিত জন-সমুদ্র এসে সেই প্রাচীরের পাষাণগাত্রে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করল, প্রাচীর তেমনি নিশ্চল রইল। শ্রান্ত-শক্তি মানুষের দল শক্তিহীন মুমূর্ষু হয়ে আহত জন্তুর মত পাঁচিলের তলায় পড়ে রইল . . . তারা মৃত্যুর আগমনী শুণছে . . . আমি . . . কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুক সেখানে চুপ করে বসেছিলাম . . . দেখি পাচিল বুঝি কেঁপে উঠছে . . . মনে হল তার প্রতি শিলায় শিলায় যেন পতনের ভয় কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আমি চীৎকার করে উঠলাম, . . . বন্ধু, জাগো . . . প্রাচীরের বুকে ভাঙন ধরেছে . . .

মুমূর্ষু'রা শ্রান্তকণ্ঠে উত্তর দিল, ভুল দেখেছ ভাই . . .

তখন কে যেন আমার মধ্যে থেকে উত্তর দিল, যদিই বা এ প্রাচীর এখনও অচল থাকে—তাতে কি ? প্রত্যেক মৃতদেহ দিয়ে আমরা সোপান রচনা করব . . . সংখ্যায় ত আমরা অনন্ত . . . একটার পর একটা . . . হয় ত সেই সোপান বেয়ে একজনও প্রাচীরের উপরে উঠতে পারবে . . . একজন মানুষের কাছেও রহস্যের স্বর্গলোকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হবে . . .

আন্‌দ্রিভের সাহিত্য মানব-মনের আলো-আঁধারের এই দ্বন্দ্ব এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নিয়ে উঠেছে। বারান্তরে তার বিশদ্ আলোচনা আমরা করব।

পরীক্ষা

(সংস্কৃত হইতে)

শ্রীসারদাচরণ রায়

কুমুদের দ্বারা হয়, জলেরি প্রমাণ।
মধুভাষী দ্বারা হয়, বিদ্যারি সম্মান ॥
বিনয়ের দ্বারা হয়, কূল পরিচয়।
তৃণ দ্বারা হয় সদা, ভূমির নিরূনয় ॥

এবারে "স্মৃতির-আলো" উপন্যাস মুদ্রিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আবার বাতের বেদনায় কষ্ট পাইতেছেন জানাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন আগামী ফাল্গুন ও চৈত্রের সংখ্যার মধ্যে স্মৃতির আলো সমাপ্ত হইবে।

মাঘ সংখ্যায় কাজী নজরুল ইস্‌লামের গজল গানে একটি ভুল থাকিয়া গিয়াছে। ১১৪ পৃষ্ঠার গজল গানের দ্বিতীয় লাইনে 'আজো' শব্দটির পর 'তার' শব্দটি বসিবে।

জঁ। ক্রিস্‌তফের দ্বিতীয় খণ্ডও চৈত্রের ভিতরই শেষ হইবে।

এবারে দিল্লী শহরে প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ১১ই, ১২ই, ১৩ই, ও ১৪ই পৌষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সম্মিলনীর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

মাননীয় স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

চৌধুরী মহাশয়ের অভিভাষণের একাংশ মাঘের সংখ্যায় মুদ্রিত হইল। আগামী সংখ্যায় অপরার্দ্ধ প্রকাশিত হইবে। নূতন সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যনায়কের মন্তব্য পাঠ করিয়া সকলেই আশান্বিত হইবেন আশা করা যায়।

বিগত পঁচিশ বৎসরের ভিতর বঙ্গের বাহিরে উত্তর ভারতের বাঙ্গালীদের সাহিত্যিকদৃষ্টি খুব প্রসারলাভ করিয়াছে। বাঙ্গলা দেশের বাহিরে থাকিয়াও বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতির নানা প্রচেষ্টার সহিত ইঁহারা যুক্ত থাকিতে প্রয়াসী। প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যসেবীবর্গের চেষ্টার ফলেই "উত্তরা" বলিয়া সুপরিচালিত মাসিক পত্রিকাখানির সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রাকৃত ভাষা হইতে বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বকালে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় ঐ ভাষা প্রচলিত ছিল। খৃষ্টীয় দশম্‌ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালা ভাষা ধীরে ধীরে ক্রমশঃ আদিচলিত ভাষা হইতে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান ভাষার মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে এবং সাহিত্যিক ভাষারূপে মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার প্রথম জীবনে নানা প্রাচীনতর বিদেশী ভাষার সংমিশ্রণে লালিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আজও বাঙ্গালা ভাষার ভিতর নানারূপ শব্দ ও প্রয়োগে পাওয়া যায়। স্বদেশে বা

বিদেশে থাকিয়া বাঙ্গালীর মনে আপনার সাহিত্য ও ভাষার উন্নতির জন্য যে উদ্বেগ দেখা যাইতেছে তাহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

উক্ত সম্মিলনে বহু দেশ হইতে বহু প্রতিনিধিবর্গ সমাগত হইয়াছিলেন। কাণপুর, ঝাঁসি, মীরাট, ইন্দোর, এলাহাবাদ, রুরকী, সাহারাণপুর, দেরাদূন, পাতিয়ালা, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, বুলন্দসর, চন্দৌসী, মজঃফরনগর, লাহোর, হরিদ্বার, পেশোয়ার, বেলুচিস্থান, জম্বু, বস্তি, জয়পুর, কলিকাতা, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় ৯৩ জন মহিলা ও পুরুষ এই উৎসবে যোগদান করেন।

অধিবেশন তিনদিনের পরিবর্ত্তে চারিদিন হয়; কারণ তিনদিনে সমস্ত প্রবন্ধ পড়িয়া শেষ করা সম্ভব হয় না।

একদিন রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর ও ফাল্গুনী নাটক দুই-খানি অভিনীত হয়। অভিনয় খুব ভাল হইয়াছিল বলিয়াই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

মহিলাগণ পৃথকভাবে মহিলাসম্মিলনীর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। এই মহিলাসম্মিলন এবারকার সম্মিলনীর একটি বিশেষত্ব। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রমুখ অনেক মহিলা এই সম্মিলনীতে যোগদান করেন। দার্জ্জিলিং হইতে শ্রীমতী হেমলতা সরকার মহাশয়া মহিলাসম্মিলনীর সভানেত্রীর কার্য্য করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন সঙ্গীত শাখার, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার শিল্প-শাখার, শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ইতিহাস-শাখার, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সিংহ দর্শন-শাখার, শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞান-শাখার সভানায়কের কার্য্য সম্পন্ন করেন। একদিন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের অসুস্থতা নিবন্ধন শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চতুর্থ দিবসের অধি-বেশনের কার্য্য পরিচালনা করেন।

যাঁহারা প্রাণপণ পরিশ্রম ও একান্ত উদ্‌যোগে এই অধিবেশনের সহায়তা করিয়াছেন তাঁহারা বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। বাঙ্গালা সাহিত্যের স্মরণ-পত্রে তাঁহাদের এই নিষ্ঠার কথা শব্দাতীত হইয়া লিখিত থাকিবে।

সঙ্গীত-শিল্পী তানসেনের নাম বাঙ্গালার ঘরে ঘরে পরিচিত। তানসেন ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে গোয়ালিয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ স্থানেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। আগামী ২৬, ২৭ ও ২৮শে জানুয়ারী তারিখে গোয়ালিয়ারে তানসেনের জন্মোৎসব হইবে। এই উপলক্ষ্যে উক্ত শহরে বহু সঙ্গীতজ্ঞ ও আচার্য্যবর্গের সমাবেশ হইবে।

সম্প্রতি বোম্বাই শহরের "ন্যাশনাল হেরাল্ড" পত্রিকা এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করিয়া বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ দশজন ব্যক্তির ধারাবাহিক নাম নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত তালিকায় উহার ফলাফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহারা প্রত্যেকেই ১০ হাজারেরও বেশী ভোট পাইয়া নিম্নোক্ত স্থানগুলি অধিকার করিয়াছেন। (১) মহাত্মা গান্ধী (২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৩) আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু (৪) পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু (৫) শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ (৬) আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (৭) শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু (৮) পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য (৯) লালা লাজপৎ রায় (১০) শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী।

গত ২৬শে পৌষ, ১০ই জানুয়ারী সোমবার কলিকাতা ঠাকুরবাড়ীতে এক গীতোৎসব হয়। উৎসবের নাম "পাগলা ঝোরা" দেওয়া হইয়াছিল। অধুনা শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় ও উদ্যোগে মাঝে মাঝে এই গীতোৎসব আমাদের প্রাণে আনন্দ দান করিয়া আসি-তেছে। দুই একটি গীতের পদ রচনার মর্ম্মের সহিত অতি সুচারু দুইটি নৃত্যের পরিকল্পনা ছিল। গানের ভাব ও শব্দ প্রকাশের সহিত এরূপ নৃত্যের ছন্দ গানের ভাবকে এক মৃদুল মধুর রসে বিকশিত করিয়া তোলে। রবীন্দ্রনাথের দেশে প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষ্য করিয়াই নাকি 'চতুরঙ্গ' গোষ্ঠী হইতে এই সঙ্গীতোৎসবের আয়োজন হয়।

সভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। বহু প্রকারের বেশধারী দর্শক ও বহু সঙ্গীতপ্রিয় শ্রোতা এই সভা সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যেই এমন অনেক অভ্যাগত ছিলেন যাঁহারা এই সঙ্গীত উপভোগ করা অপেক্ষা তাঁহারা যে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছেন তাহাই যেন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। যখন সভা মণ্ডপের অন্য প্রান্তে সঙ্গীতের স্বরলহরী মুগ্ধ শ্রোতাকে আবিষ্ট করিয়া তুলিতেছিল, সেই সময়ে কোথাও কোথাও কেহ কেহ বসিয়া নিজেদের ভিতর নানাপ্রকার গল্প চালাইতেছিলেন। এক স্থানে দুইটি ভদ্রলোক Mrs. Willams-কে At Home দেওয়া সম্বন্ধে আলোচনায় নিযুক্ত অন্যস্থানে মেডিক্যাল কলেজের M. B. পরীক্ষার ফলাফল লইয়া গল্প চলিতেছিল। এরূপ অভ্যাগতগণ শিক্ষিত ও মান্য ব্যক্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা কেন এরূপ ধরণের সম্মিলনীতে আসিয়াও সাধারণ বিবেচনা শক্তি হারাইয়া ফেলেন তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, নিত্যকার কর্ম্মকোলাহলের অবসরের ভিতর আনন্দ লাভ করিবার জন্যই এই গীত-নৃত্যের সার্থকতা। যাঁহারা আসেন, তাঁহারা একাগ্র মনেই ইহাতে যোগদান করেন। যখন সকলে নীরব স্তব্ধভাবে সঙ্গীত শ্রবণে নিবিষ্ট তখন অন্য লোক যদি তাঁহাদেরই কানের কাছে বসিয়া তাঁহাদের কাজের বা প্রাত্যহিক জীবনের কর্ম্মধারার আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকেন তাহা হইলে অপরের পক্ষে তাহা অত্যন্ত ব্যাঘাতজনক হয়।

এই উৎসব অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অন্যান্য আসরের মত এখানেও আগে উঠিয়া যাওয়ার তাড়া। তাহাতেই মনে হয়, যতই কেন আমরা শিক্ষা ও সভ্যতার বড়াই করি না, প্রতিদিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে ও ব্যবহারে আমাদের সাধারণ সৌজন্যেরও অভাব ধরা পড়ে। হঠাৎ মাঝখানে কয়েকটি সাহেবী পোষাকধারী ভদ্রলোক তাঁহাদের পরিজনবর্গ লইয়া সভাস্থল ত্যাগ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। হয় ত বিশেষ কোনও কারণ বশতঃই তাঁহাদের এই অল্প সময়টুকু থাকিয়া যাওয়া সম্ভব হয় নাই। কিম্বা dinner-এর time বা তদ্রূপ কোনও সঙ্গত কারণেই তাঁহাদের ঘড়ি ধরিয়া যাওয়া প্রয়োজন ছিল। যদি তাহাই হয়, তাঁহাদের এমন স্থানে আসন সংগ্রহ করিয়া বসা উচিত যে, যেখান হইতে এরূপ ধরণের সঙ্গীত-সভা হইতে মাঝখানে উঠিয়া চলিয়া যাইতে হইলে যেন অন্য কাহারও উপভোগে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে।

এতকাল পরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "পথের দাবী" উপন্যাসখানি সত্যই বাজেয়াপ্ত হইল। গত বুধবারের (১২ই জানুয়ারী, ১৯২৭) Extra Ordinary গেজেটে উহা বাজেয়াপ্ত হইল বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। বাংলাদেশের একখানা উপন্যাসকেও শেষকালে খাশদখলে টানিতে হইল! বাংলা সাহিত্যের পরম ক্ষতি যে একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এরূপে বন্ধ হইয়া গেল।

যাঁহারা বাঙ্গলায় কেবল ন্যাকামী ও প্রেমের কাহিনী লইয়া গল্পলেখা হইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, আজকাল নূতন লেখকের পক্ষে ইহা ভিন্ন উপায়ন্তর নাই। শাস্ত্র, রাষ্ট্র, বা রাজ্য লইয়া কোনও গল্পলেখা অলিখিত আইন্ দ্বারা নিষিদ্ধ। যাহা প্রত্যেক বাঙ্গালী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে, তাহা ভাষায় বা লেখায় প্রকাশ করা এ দেশের লোকের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কেবলমাত্র গৃহস্থালীর ছোটখাটো ঘটনা লইয়াই গল্পরচনা সম্ভব। নূতন লেখকেরা সকলেই কিছু এমন প্রতিভাশালী লেখক নহেন যে, একটি ছোট ঘটনা লইয়াও যদি লেখেন তাহাই সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।

ম্যাগেজিনে যাঁহারা লেখেন, তাঁহাদের সকল লেখাই কিছু বীণাবাদিনীর কণ্ঠভূষণে স্থান পাইবে না। লিখিতে লিখিতে শতেক লেখকের মধ্যে হয় ত একজন বা ততোধিক লেখক সুলেখক বলিয়া গণ্য হইবেন। এমনই হইয়া আসিয়াছে। আজ কিছু নূতন নয়। যাঁহাদের নাম করিয়া বর্ত্তমান কালের লেখকবর্গের তুলনা করা হয়, একদিন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই ম্যাগেজিনে লিখিয়া-

ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে অন্য যাঁহারা সে সময়ে লিখিতেন তাঁহাদের সকলেরই কিছু সমান খ্যাতি হয় নাই।

আজকালকার নূতন লেখকদের সম্বন্ধে আরও একটি অভিযোগ শোনা যায় যে, তাঁহাদের প্রকাশ করিবার মত কিছুই নাই, অথচ তাঁহারা কতকগুলি 'অপদার্থ' বস্তু রচনার আকারে প্রকাশ করিয়া থাকেন। 'পদার্থ' হইতে যাহা, রূপে, রসে বা গুণে ভিন্ন তাহারই সংজ্ঞা যদি 'অপদার্থ' হয় তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হয় যে, 'অ-পদার্থের' ভিতরও রূপ, রস বা গুণ আছে। নহিলে তাহাকে 'অ-পদার্থও' আখ্যা দেওয়া চলিত না। সে রূপে বা রসে যদি কদর্য্য কিছু থাকে তাহা মক্ষিকারই ইচ্ছার বস্তু, মধুরসগ্রহণেচ্ছু কেবলমাত্র তাহার রসমাধুর্য্যটুকুই আহরণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন্।

আমরা মন খাটাইয়া সজীবভাবে যে জ্ঞান উপার্জ্জন করি, তাহা আমাদের চিন্তা ও মজ্জার সহিত মিশিয়া যায়। মুখস্থ করিয়া যাহা আপন বলিয়া পাই তাহা বাহিরে দাঁড়াইয়া আমাদের সঙ্গে অপরের বিচ্ছেদ ঘটায়। জ্ঞান-তপস্বীর বিনয় ও তিতিক্ষা আর থাকে না। অহঙ্কার, রাংতার মকুট লইয়াই ব্যস্ত থাকে। গৌরব যতদিন নীরব থাকে তখন মানাইলেও, তাহাই যখন আবার গৌরবে বহু-বচন হইয়া উঠে তখন তাহা অসহ্য হইয়া উঠে। পদতলের তপ্তবালুর উত্তাপের মতই তাহা দুঃসহ বোধ হয়।

নিজের সাধনাকে শক্তিদ্বারা উদ্বোধিত করিতে নিজের মনকে যে বেতন দিতে হয়, তাহা পরের বেতন-ভোগী লোকের পক্ষে ধারণাতীত বস্তু। সেই কারণেই হয়ত আজকাল লেখকের সংখ্যা অপেক্ষা লেখার বিচারক বেশী। কিন্তু তাঁহারা সমালোচক নহেন।

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথবাবু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক-বর্গ বর্ত্তমানকালের লেখকদের যেরূপ স্নেহের চক্ষে দেখেন ও উৎসাহ দিয়া থাকেন, তাহাতে মনে হয়, যিনি সত্যই ক্ষমতাশালী তিনি কখনও অধমকে হেলার চক্ষে দেখেন না।

নূতন লেখক আসিবে ইহা কালের ধর্ম্ম। নূতনকে যাঁহারা সম্ভাষণ করিতে অক্ষম, তাঁহারা সৃষ্টির সকল বৈচিত্র্য ও অনাগত ঐশ্বর্য্যকে অস্বীকার করিবেন ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের অন্তর্দ্ধানের শোক ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তে মানুষকে মর্ম্মাহত করিয়াছে। তিনি নিজ আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যে অকাল মৃত্যু গ্রহণ করিলেন, তাহা মানুষ মাত্রেরই শ্লাঘার বস্তু। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, শ্রদ্ধানন্দজী ইহা অপেক্ষা আর কোনও শ্রেষ্ঠতর মৃত্যু অভিলাষ করিতে পারিতেন না। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের চরিত্র ও জীবনের কর্ম্মপদ্ধতিতে যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার অভিষেক মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা অসীম হইলেও সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে সাধনার ধন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ধর্ম্মে, বিশ্বাসে, সংসর্গে ও প্রচারে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যই যুদ্ধ করিয়াছেন। এই বিরাট ভারত-ভূমির অধিবাসীবৃন্দের সম-স্বাধীনতার দৃঢ়ভিত্তির উপর ভারতের এক অপূর্ব্ব জাতীয়তার সৌধ গড়িয়া তুলিবার জন্যই তিনি আজীবন কার্য্য করিয়াছেন। অসহিষ্ণুতা ও অন্ধ অনুগমনের তিনি একান্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি নিজেদের জন্য যাহা দাবী করিতেন, অপর সকলকেও সেই অধিকার ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রেমের ভিত্তি-ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্ম ও সমাজের পূর্ণ স্বাধীনতার বেষ্টনীর মধ্যে সকলে বাস কর ও অপরকেও বাস করিতে দাও—ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ।

আজ নীরবে সকল প্রাণ হইতে এই প্রার্থনাই উত্থিত হউক যে, তাঁহাকে ভুল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বা অন্য কোনও অসঙ্গত কারণে প্রণোদিত হইয়া যে এরূপ নৃশংস ভাবে হত্যা করিয়াছে, স্বামিজীর প্রেম ও প্রীতির আদর্শই তাহার ও মানব সাধারণের চিত্তকে যেন সদ্গতি দান করে।

Published by Sj Dineshranjan Das from 10-2, Patuatola Lane and Printed by S. K. Chatterjee, Bani Press, 33A, Madan Mitter Lane, Calcutta.

বীরবল

চতুর্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৩৩ সাল

সম্পাদক

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

কল্লোল পাবলিশিং হাউস,
১০।২, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

কল্লোল

ফাল্গুন, ১৩৩৩

বন্দীর বন্দনা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী করি' রচেছ আমায়,
নির্ম্মম নির্ম্মাতা মম, এ কেবল অকারণ আনন্দ তোমার !
মনে করি, মুক্ত হব ; মনে ভাবি রহিতে দিব না
মোর তরে এ নিখিলে বন্ধনের চিহ্নমাত্র আর।
রুক্ষ দস্যু-বেশে তাই হাস্যমুখে ভেসে যাই উচ্ছ্বসিত স্বেচ্ছাচার-স্রোতে,
উপেক্ষিয়া চলে' যাই সংসার-সমাজগড়া লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র কণ্টকের
নিষ্ঠুর আঘাত ; দাসত্বের স্নেহের সন্তান
সংস্কারের বুকে হানি তীব্রতীক্ষ্ণ রূঢ় পরিহাস,
অবজ্ঞার নীরব ভর্ৎসনা।
মনে ভাবি, মুক্তি বুঝি কাছে এলো—
বিশ্বের আকাশে বহে লাবণ্যের মৃত্যুহীন স্রোত !

তারপর একদিন অকস্মাৎ বিস্ময়ে নেহারি—
কোথা মুক্তি ?
সহস্র অদৃশ্য বাধা নিশিদিন ঘিরে আছে মোরে,
যতই এড়ায়ে চলি, ততই জড়ায়ে ধরে পায়ে,
রোধ করে জীবনের গতি !
সে-বন্ধন চলে মোর সাথে সাথে জীবনের নিত্য অভিসারে
সুন্দরের মন্দিরের পানে।
সে-বন্ধন মগ্ন করি' রেখেছে আমারে
আকণ্ঠ পঙ্কের মাঝে।

সে-বন্ধন লক্ষ লক্ষ লাঞ্ছনার বীজাণুতে
কলুষিত করিয়াছে নিঃশ্বাসের বাতাস আমার।
লোহিত শোণিত মম নীল হয়ে গেছে সে-বন্ধনে!
ক্ষণতরে নাহি মুক্তি ; কর্ম্মমাঝে, মর্ম্মমাঝে মোর,
প্রতি স্বপ্নে, প্রতি জাগরণে,
প্রতি দিবসের লক্ষ বাসনা-আশায়
আমারে রেখেছ বেঁধে অভিশপ্ত, তপ্ত নাগপাশে
সৃজন-ঊষার আদি হতে,
উদাসীন স্রষ্টা মোর!
মুক্তি শুধু মরীচিকা—সুমধুর মিথ্যার স্বপন,
আপনার কাছে মোরে করিয়াছ বন্দী চিরন্তন!

বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দ্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষ বর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গারের হিয়া
রমণী-রমণ-রণে পরাজয়-ভিক্ষা মাগে নিতি।
তাদের মিটাতে হয় আত্ম-বঞ্চনার নিত্য ক্ষোভ।
আছে ক্রুর স্বার্থদৃষ্টি, আছে মূঢ় স্বার্থপর লোভ,
হিরন্ময় প্রেমপাত্রে হীন হিংসা-সর্প গুপ্ত আছে ;
আনন্দ-নন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন,
জিঘাংসার কুটিল কুশ্রিতা!
সুন্দরের ধ্যান মোর এরা সব ক্ষণে ক্ষণে ভেঙে দিয়ে যায়
কাঁদায় আমারে সদা অপমানে, ব্যথায় লজ্জায়।
ভুলিয়া থাকিতে চাই ; ক্ষণতরে ভুলে' যাই ডুবে' গিয়ে লাবণ্য-উচ্ছ্বাসে
তবু, হায়, পারি নে ভুলিতে!
নিমেষে নিমেষে ত্রুটি, পদে পদে স্খলন-পতন,
আপনারে ভুলে-যাওয়া, সুন্দরের নিত্য অসম্মান।

বিশ্বস্রষ্টা, তুমি মোরে গড়েছ অক্ষম ক'রে যদি,
মোরে ক্ষমা করি' তব অপরাধ করিয়ো স্খালন।
জ্যোতির্ময়, আজি মম জ্যোতির্হীন বন্দীশালা হ'তে
বন্দনা-সঙ্গীত গাহি তব।
স্বর্গলোভ নাহি মোর, নাহি মোর পুণ্যের সঞ্চয়,
লাঞ্ছিত বাসনা দিয়া অর্ঘ্য তব রচি আমি আজি ;
শাশ্বত সংগ্রামে মোর বিক্ষত বক্ষের যত রক্তাক্ত ক্ষতের বীভৎসতা,
হে চির-সুন্দর, মোর নমস্কার-সহ লহ আজি।

বিধাতা, জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার
অমৃতের তরে।
না-হয় ডুবিয়া আছি কৃমি-ঘন পঙ্কের সাগরে,
গোপন অন্তর মম নিরন্তর সুধার তৃষ্ণায়
শুষ্ক হয়ে আছে তবু।
না-হয় রেখেছ বেঁধে ; তবু জেনো, শৃঙ্খলিত ক্ষুদ্র হস্ত মোর
উধাও আগ্রহভরে ঊর্দ্ধনভে উঠিবারে চায়
অসীমের নীলিমারে জড়াইতে ব্যগ্র আলিঙ্গনে।
মোর আঁখি রহে জাগি নিস্তব্ধ নিশীথে
আপন আসন পাতে নিদ্রাহীন নক্ষত্র-সভায়,
স্বচ্ছ শুভ্র ছায়া-পথে মায়া-রথে ভ্রমি ফিরে কভু
আবেশ-বিভ্রমে।
তুমি মোরে দিয়েছ কামনা, অন্ধকার অমা-রাত্রি-সম।
তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্ন-সুধা মম।
তাই মোর দেহ যবে ভিক্ষুকের মত ঘুরে' মরে
ক্ষুধাজীর্ণ, বিশীর্ণ কঙ্কাল—
সমস্ত অন্তর মম সে-মুহূর্তে গেয়ে ওঠে গান
অনন্তের চির-বার্ত্তা নিয়া ;
সে কেবল বার বার অসীমের কানে কানে একটি গোপন বাণী কহে—

"তবু আমি ভালোবাসি, তবু আমি ভালবাসি আজি!"
রক্তমাঝে মদ্যফেণা, সেথা মীন-কেতনের উড়িছে কেতন,
শিরায় শিরায় শত সরীসৃপ তোলে শিহরণ ;
লোলুপ লালসা করে অন্যমনে রসনা-লেহন ;—
তবু আমি অমৃতাভিলাষী—
অমৃতের অন্বেষণে ভালোবাসি, শুধু ভালোবাসি,
ভালোবাসি—আর কিছু নয়!
তুমি যারে সৃজিয়াছ, ওগো শিল্পী, সে তো নহি আমি,
সে তোমার দুঃস্বপ্ন দারুণ ;
বিশ্বের মাধুর্য্য-রস তিলে তিলে করিয়া চয়ন
আমারে রচেছি আমি ; তুমি কোথা ছিলে অচেতন
সে মহা-সৃজনকালে—তুমি শুধু জান সেই কথা।

মোর আপনারে আমি করিয়াছি নব-জন্মদান।
নিখিলের স্রষ্টা তুমি, তোমার উদ্দেশে আজি তাই
মোর এই সৃষ্টিকার্য্য উৎসৃষ্ট করিনু সন্তর্পণে।
মোর এই নবসৃষ্টি—এ যে মূর্ত্ত বন্দনা তোমার,
অনাদির মিলিত সঙ্গীত।
আমি কবি, এ সঙ্গীত রচিয়াছি উদ্দীপ্ত উল্লাসে
এই গর্ব্ব মোর—
তোমার ত্রুটিরে আমি আপন সাধনা দিয়া করেছি শোধন
এই গর্ব্ব মোর—
লাঞ্ছিত এ বন্দী তাই বন্ধহীন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
বন্দনার ছদ্মনামে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ গেল হানি' তোমার সকাশে॥

কবিত্বহীন গল্প

গোকুলচন্দ্র নাগ

তখন বেলা পাঁচটা হবে। ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে ভিতর-বাড়ীর বিশেষ কোন একটা ঘর থেকে বিষম হাসি গান আর চীৎকার শব্দ উঠ্‌ছিল, এখন সেটা একেবারে থেমে গিয়েছে। ব্যাপার কি দেখ্‌বার জন্যে আমি বাইরের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। একটা দালান পার হ'য়েই রামাকে দেখ্‌তে পেয়ে তাকে জিগেস করে জানলাম— বাড়ীর ভিতরকার এঁরা কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কোন প্রতি-বেশিনীর বাড়ী টহ্‌ল দিতে গিয়েছেন। সংবাদটা যে আমার দেহে অমৃত বর্ষণ করে নি সে কথা বলাই বাহুল্য। রামাকে ধম্‌কে বল্‌লাম, তা আমাকে বলে যেতে কি হয়েছিল?

সে বেচারী মুখখানা ছোট করে বল্‌ল, তা ত জানি না বাবু, যাবার সময় মা-ঠাক্‌রুণ বল্‌লেন, আমি বোস্‌ সাহেবদের বাড়ী যাচ্ছি বাবুকে বলিস্।

চাকরের সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভ নেই, তার মা-ঠাক্‌রুণ স্বাধীন জেনানা। একখানা চাদর কাঁধের ওপর টেনে নিয়ে রামাকে বল্‌লাম, তোর মা-ঠাক্‌রুণকে বলিস, বাবু যম্‌সাহেবের বাড়ী গিয়েছেন নেমন্তন্ন আছে।

রামা কিছু বুঝতে না পেরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা ঢোঁক গিলে বল্‌ল, যে আজ্ঞে

রমেশদের বাড়ী এসে দেখি, আমার কতকগুলি বন্ধু জমায়েত হয়েছেন। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়, এই আড্ডাতে প্রায় আট রকমের আলোচনা চলছে—ঘরের চারিদিকে দু'ইজন তিনজন করে এক একটি দল করে বসে আছে। ধীরেন্দ্রের কবিতা, প্রফুল্লর শিল্প, সতীশের দর্শন, প্রশান্তর বিজ্ঞান প্রভৃতি পরস্পরকে পাল্লা দিয়ে ক্রমেই সপ্তমে চড়ে উঠ্‌ছে; সঙ্গে সঙ্গে রমেন, সুরেন, মোহিনী আরো দুচারটি মহাপুরুষের হুঁ, তা বৈকি, Splendid, আল্‌বৎ এবং টেবিল চাপড়ানির শব্দ পাড়াটিকে দিব্যি গুলজার করে দিচ্ছিল। আমার প্রবেশটা সেখানে অনধিকার হবে কি না, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তাই ভাব্‌ছি এমন সময় ঘরের ভিতর হ'তে কে একজন বলে উঠ্‌ল— "ঐ যে কমল-দা! তার পরেই—ধরে আন্, পাকড়াও উস্কো, প্রভৃতি মোলায়েম কথাগুলি থামবার পূর্ব্বেই জন পাঁচছয় ডাকাত আমায় শূন্যে তুলে নিয়ে একেবারে ঘরের মাঝখানে এনে বসিয়ে দিল! আমার তখন প্রায় ইষ্ট

মন্ত্র জপ করবার মত অবস্থা হয়েছে, সভাশুদ্ধ লোক এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠ্‌ল—গল্প বল।

আমি বল্লাম, কিন্তু—

রমেশ নিজের মুখে আঙুল রেখে চোখ পাকিয়ে বলল, চুপ, কোন ওজর চল্‌বে না।

সকলে গর্জ্জে উঠ্‌ল—গল্প বল। অনেক কষ্টে তাদের থামিয়ে বল্‌লাম, কিন্তু তোমাদের ত বেশ আলোচনা চল্‌ছিল, তাই চলুক না, আমি শুনি।

সকলে মাথা নেড়ে এক সঙ্গে বল্‌ল—উঁহু। পর মুহূর্ত্তে দেখি আমার চার পাশে সকলে ভিড় করে বসে গিয়েছে।

আমি বললাম, তোমাদের মতলবটা কি শুনি?

রমেশ বল্‌ল, গল্প শুন্‌ব।

আমি বল্‌লাম, এই রকম জোর জবরদস্তি ক'রে?

সকলে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—আলবৎ।

আমি বল্‌লাম, তোমরা দেখছি কিল মেরে কাঁটাল পাকাতে চাও। আমার ত কোন গল্প মনে আস্‌ছে না।

ধীরেন বল্‌ল, কুচ্‌ পরোয়া নেই, বলে যাও।

এও ত ভারি মুশকিল, কি করি,—নিরুপায় হয়ে বল্‌লাম, কি রকম গল্প শুনতে চাও?

ভীষণ চীৎকার উঠ্‌ল—প্রেমের।

সে চীৎকারে প্রেমের অন্ত্যেষ্টি হয়ে গেল বোধ হয়। দার্শনিক সতীশচন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লাম, তোমারও কি ঐ মত?

সে বেশ গম্ভীর ভাবেই আমায় বোঝাল—অধিকতম মনুষ্যের মত অবশ্য গ্রাহ্য।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, দেখি কতটা পারি। কিন্তু আগে থেকেই আমি বলে দিচ্ছি, যদি ভাল না লাগে তা হলে আমার দোষ দিতে পাবে না। ধীরেন তোমার হয় ত সেই কবিতাটা মনে আছে—

"'তোমরা পারবে না গো, পারবে না ফুল ফোটাতে।"

শিল্পী প্রফুল্ল তার বাব্‌রি চুল সমেত মাথাটা একটু বেশ কবিত্ব পূর্ণ দোলা দিয়ে বল্‌ল, রবীন্দ্রনাথের ও যুক্তি আমি মান্‌তেই চাই না। কেউ যদি ঠিকমত চেষ্টা করে তা হ'লে ফুল কেন, অনেক জিনিষই ফোটাতে পারে।

সুরেন সকলের নজর এড়িয়ে একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে বল্‌ল, হাঁসের ডিম পর্য্যন্ত।

গীড্‌ মোপসাঁ সাক্ষী আছে। আর নয়জন একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল—আলবৎ।

খুব একচোট হাসি হয়ে গেল।

আমি গল্প বল্‌বার পূর্ব্বে সামান্য একটু ভূমিকা ক'রে বল্‌লাম, আমার মনে হয় কোন গল্প বলবার পূর্ব্বে নায়ক নায়িকার নাম বলে রাখলে বক্তা এবং শ্রোতা উভয় পক্ষেরই বিশেষ সুবিধা হয়। আর আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত বলে উঠ্‌ল,—তার মানে কি—বিজ্ঞান সম্মত এর কি প্রমাণ আছে? আমি এতে মত দিতে পারি না।

আমি বল্‌লাম, বিজ্ঞান সম্মত কোন প্রমাণ দেখাতে পারব কি না জানি না, তবে আমার যা মনে হয় তাই বলছি—যেমন কুমুদ বল্‌লেই আমরা অন্য সমস্ত ফুল ভুলে গিয়ে তাকেই মনে করি যার এই বিশেষ নামটি, আর গোলাপের কাঁটা হাতে ফোট্‌বার সম্ভাবনা থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে অনেক কথাই স্পষ্ট হয়ে যায়।

রমেন বলল, প্রশান্ত তোর পায়ে পড়ি ভাই, কমল-দাকে বল্‌তে দে, আর তোর তর্কগুলো একটু ঝুড়ি চাপা দিয়ে রাখ্‌।

আমি বললাম, আমার গল্পের যিনি নায়ক তাঁর নাম প্রেমাঞ্জন। মোহিনী তার মোটা হাত দুটো সজোরে টেবিলের ওপর চাপড়ে বল্‌ল—Splendid! একে প্রেমের গল্প, তার ওপর নায়কের নাম প্রেমাঞ্জন; বগলাচরণও নয় আর দিগম্বরও নয়। সোনায় সোহাগা! থাম্‌লে কেন? বলে যাও, বলে যাও।

আর একটা হাসির হর্‌রা থাম্‌লে আমি বল্‌লাম, যাঁরা এই হস্তপদাদিবিশিষ্ট মনুষ্য নামক সচেতন জীবটির প্রেমাঞ্জন নামকরণ করেছিলেন, তাঁরা একটি মস্ত বড় ভবিষ্যৎ বাণী করে ছিলেন।

নামের সঙ্গে স্বভাবের এমন আশ্চর্য্য রকমের মিল কখনও দেখি নি! শৈশবের দুগ্ধ-প্রেম, কৈশোরের কাঁচা আম, ঝালচাট্‌নী, ঘুড়ি লাটাই এবং কলহ-প্রেম এত

তাড়াতাড়ি অঞ্জন থেকে অন্ধতার আকার ধরছিল যে, সকলেই বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। প্রেমাঞ্জন মধুর মনে করলেও তার অভিভাবকগণ এই প্রকার প্রেমের পরিণামটাকে বেশ ভয়ের চোখেই দেখতেন। কিন্তু সে তখন প্রেমে এমনই আত্মহারা যে তাঁদের হাজার উপদেশের বাধা উপেক্ষা করে মনের লাগামে আল্‌গা দিয়ে তার ইচ্ছার ঘোড়া ছুটিকে অবাধে ছুটিয়ে চলে ছিল। তারপর সে ঐ সমস্ত প্রেমের নেশা কাটিয়ে আর একটি নূতন প্রেমের স্রোতে গা ভাসান দিল। এটি তার পুস্তক প্রেম। তখন তার বয়স বাইশ কি তেইশ।

দিদি-মা বললেন, হাঁ রে বিশু, তুই সব পাশ্‌টাস্ ত শেষ করলি, তবু দিনরাত মুখে বই চাপা দিয়ে অত কি পড়িস বল্ ত?

একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি—নবাযুগের বাপ মায়ের দেওয়া কেতাবী নাম দিদিমার মোটেই ভাল লাগে না, তাই তিনি আমাদের প্রেমাঞ্জনের নাম রেখেছিলেন, বিশ্বনাথ, আদর করে বিশু বলে ডাকতেন। প্রেমাঞ্জন নামের গুণেই হোক্ আর দাঁত ভাঙবার ভয়েই হোক সকলে দিদিমার দেওয়া বিশু নামটাই পছন্দ করে নিয়েছিলেন, আর আমিও তাই বলে ডাকি।

সত্যি কথা বল্‌তে কি বরং বিশু পূর্ব্বে যে সমস্ত প্রণয়িনীর প্রেমে পড়েছিল তা অনেকেই কিছু কিছু সহ্য করেছিলেন; কিন্তু তার এই নূতন প্রেমোচ্ছ্বাসটি কেউই সহ্য করতে রাজি হলেন না। উল্‌টে নিজেদের ইচ্ছামত তাকে কি একটা প্রেমে ফেলবার জন্যে সকলে উঠে পড়ে লাগলেন। বেচারী বিশু নিরুপায় হয়ে তার নূতন প্রণয়িনীদের অগাধ প্রেমসলিলে ডুব দিয়ে ভাব্‌ল তার চারিদিকের এই মীল, স্পেন্সার প্রভৃতি জগৎবিখ্যাত ওঝারা তাকে সকল উপদ্রব হতে রক্ষা করবে। তা ছাড়া, সম্পর্কে ঐ সমস্ত ওঝারা বিশুর প্রিয়তমাদের পিতা হলেও যারা বাধা দিতে আসে, জানি না কোন্ মন্ত্র বলে তাদের ভাত্রবধূরূপে তাদের সামনে এসে দাঁড়ান। আমিও তাদেরই মধ্যে একজন যারা বিশুর এই প্রেমে বাধা দিতে গিয়েছিল। আমরা সকলেই রণে ভঙ্গ দিয়েছি; কিন্তু নেপথ্য থেকে একজন কে বড় ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে বস্‌ল। হাজার বই-এর পাতার ফাঁক দিয়ে বিশুর কানে তা ভেসে এসে তার সমস্ত দেহে যেন আগুন জেলে দিল।

খুব চীৎকার করে বিশু তার ছোট ভাইকে কবিতা পড়াচ্ছিল—Life is but an empty dream.—যিনি সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাঁর কানে যখন বিশুর আবৃত্তি পৌছল তখন তাঁর ঠোঁট ছুটিতে যে হাসি ফুটে উঠ্‌ল, তা বিশুর রুদ্ধ চোখের পাতা খুলে দিয়ে ডাকাতের মত মহা উৎপাত করে তার বুকখানিকে কাঁপিয়ে দিল। প্রাণপণ শক্তিতে সে তার প্রিয় বইগুলি বুকে চেপে মনে মনে জপ করতে লাগল, Women are fiends in disguise, Vampires.

মোহিনী ভারি বিরক্ত হয়ে বলে উঠ্‌ল, কিন্তু কমল-দা, এ তোমার বড় অন্যায়। প্রেমের গল্প বলব বলে কি একটা লক্ষ্মীছাড়ার কথা বল্‌তে আরম্ভ করলে?

আমি বল্লাম, তোমাদের ত পূর্ব্বেই বলেছি—কিল মেরে কাঁটাল পাকান যায় না; এখন খাও এঁচড় আর নয় ত বল এই খানেই খতম করি। নির্ম্মল বলল, "না না, বলে যাও, কিন্তু দোহাই কমল-দা, শেষটা মজিও না, অন্তত আমাদের খাতিরে। ট্র্যাজেডী আমি মোটেই পছন্দ করি না, কমেডি-টাই ভালবাসি তবে একটু রোমান্টিক হলেই বেশ হয়।

প্রশান্ত এবার ভয়ানক চটে গিয়ে বল্‌ল, আমি একটা কথা বললে তোমাদের অসহ্য লাগে, এখন তোমরা কি করছ?

সকলকে থামিয়ে আমি বল্‌তে আরম্ভ করলাম।

যে দিন ক্লান্তিবশতঃ বিশু প্রিয়ার মুখ হ'তে দৃষ্টি তুলে বাইরের দিকে তাকাল, সেদিন বাইরের অদ্ধেক জিনিষই তার চোখের দৃষ্টি হতে মুছে গিয়েছে দেখে তার বুকের ভিতরটা কি রকম করে উঠ্‌ছিল জানি না, তবে তার সামনেকার সেই অদৃশ্য ঘসা কাচের আবরণটি সরিয়ে ফেল্‌তে না পেরে তার চোখ জলে ভরে উঠ্‌ছিল দেখেছি।

একজন সাহেব-ডাক্তার ঐ অদৃশ্য ঘসা কাঁচের আবরণটি

দূর করবার জন্যে একটি দৃশ্যমান কাঁচের আবরণ তার চোখের উপর বসিয়ে দিল। বিশুর মুখখানির অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। অনেকেই বল্লেন, বেশ মানিয়েছে। দিদি-মা কিন্তু কেবলই দুঃখ করে বলতে লাগলেন, আহা অমন চোখদুটি পোড়ার-মুখো ডাক্তার কাঁচ দিয়ে ঢেকে দিল! কেন, পিরথিমিতে কি ওষুধে আগুন লেগেছে না কি? আমি কালই 'ছিকেষ্ট' কব্‌রেজকে আনাচ্ছি।

ডাক্তার-সাহেব বিশুকে বল্‌লেন, এখন কিছুদিনের মত তোমার পড়াশোনা বন্ধ। বিশু প্রায় কেঁদে ফেলেই বল্‌ল, তবে আমি কি নিয়ে থাকব?

ডাক্তার বল্‌লেন, পড়া ছাড়া কি আর অন্য কোন কাজ তুমি জান না। তুমি বই-এর পাতায় যা পড়ে দেখেছ তা সমস্তই যে বাইরে থেকে চুরি করা। প্রকৃতিকে নকল করবার বৃথা চেষ্টা, তা কি জান না? তুমি ত অনেক পড়েছ একবার তার সঙ্গে বাইরের একটু পরিচয় করিয়ে নাও না?

রোদের তাপ মরে গেছে, খোলা জানালার কাছে একখানা চেয়ারের উপর বিশু চুপ করে বসে ছিল। আমগাছের ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে গোধূলীর পিঙল আভা দেখা যাচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার শ্রান্ত দেহের উপর মধুর পরশ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। নীচের কোন একটি ঘরে ছোট ছোট মেয়েরা মিহি সুরে গান ধরেছে—

ওগো দখিন হাওয়া,
ও পথিক হাওয়া
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।

ছেলেমেয়েদের এলোমেলো সুরের ভিতর দিয়ে আর একটি সুর হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছিল। সে সুর শুনে বিশুর বুক কেঁপে উঠ্‌ল। টেবিলের উপর ছড়ান বইগুলির দিকে তাকিয়ে সে আপনার মনে বল্‌ল, কি লাভ হল আমার? বিশুর এই উপেক্ষায় তার প্রিয়তমাদের দিক্ দিয়ে কিন্তু কোনই সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সে আস্তে আস্তে নীচে নেমে এসে যেখানে ছেলেমেয়েরা হুটোপাটি করে গান করছিল সেইখানে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গান গোলমাল থেমে গেল। কেবল একটি মেয়ে বিশুকে দেখতে পায় নি। সে তখনও আপন মনে মাথা দুলিয়ে গেয়ে যাচ্ছিল—

"কানে কানে একটি কথায়
সকল ব্যথা দেয় ভুলিয়ে।"

বিশু তাকে কোলে তুলে নিয়ে বল্‌ল, চাঁপা, লক্ষ্মী মা আমার, আবার গাও ত। চাঁপা কিন্তু এমন ভাব দেখাতে লাগ্‌ল যেন ছাড়া পেলে একছুটে পালানটাই গান করার চেয়ে তার ঢের ভাল লাগে। একে একে সব কটিই ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে, কেননা গানের আড্ডায় এই লোকটিকে সকলেই একান্ত অনাবশ্যক মনে করেছিল।

বিশু মুখ তুলে প্রথম যাকে দেখ্‌ল ভদ্রতার খাতিরে তাকে একটা অভ্যর্থনার কথাও না বলাতে আমি ভারি চটে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার মুখখানা যেন একটু অস্বাভাবিক ধরণের লাল দেখেছিলাম বলে মনে হয়, তবে ঠিক্ বলতে পারি না, কেন না আমারও চোখ খারাপ কি না!

কোন প্রকারেই বিশু সহজভাবে জ্যোৎস্নার সঙ্গে কথা কইতে পারল না, সে যেন আজ প্রথম স্ত্রীলোক সাম্‌নে দেখল। অনেক কষ্টে মনে বল সঞ্চয় করে এক গা ঘেমে কার্পেটের উপর পা দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে সে বলে ফেল্‌ল, তুমি—আপনি কবে এলেন?

তাকে সম্বোধন করে বিশু এত কথা বল্‌ল, তার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে মাথা তুলে দেখে ঘরে কেউ নেই, সে একা বসে আছে!

আমার শ্রোতাদের মধ্যে ভয়ানক একটা কলরব উঠ্‌ল—"ভারি গল্প বলছেন। কত কষ্টে যদিও বা দুজনে একটু কাছাকাছি হ'ল অমনি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিয়ে ভারি গল্প বললে, হাঁ!

মোহিনী বলল, নিশ্চয় কমল-দা'র মাথা খারাপ হয়েছে নইলে এমন সুন্দর সিচুয়েশন্‌টার সর্ব্বনাশ করে হে! এমন সুযোগ যে একেবারে মাঠে মারা গেল, বল কি?

জন পাঁচ ছয় বন্ধু হতাশ হয়ে চলে যাবার জন্যে বাইরে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে তাদের আবার ফিরে

আস্‌তে দেখে প্রশান্ত বল্‌ল, কি হে, তোমরা আবার ফির্‌লে যে!

তাদের আর উত্তর দিতে হ'ল না। ভয়ানক ঝড় আর বাজ পড়ার শব্দ সকলকে বেশ করেই বুঝিয়ে দিল, এখানেই এখন কিছুক্ষণ থাকতে হবে।

হাত জোড় করে ধীরেন বল্‌ল, দোহাই কমল-দা, চাঁদের আলো, পাপিয়ার তানটান একটু ছাড়, নইলে যে একদম নিরামিষ্য হয়ে যায়, ভালবাসি টাসি দু' একটা শোনাও, বাদলার সন্ধ্যাটা কাট্‌বে ভাল।

আমি বল্‌লাম, তাতে আমার আপত্তি নেই, তবে হিসেবে একটু গরমিল হয়ে যায় এই যা। আর তা ছাড়া সব দিক্ বাঁচিয়ে ত চল্‌তে হ'বে। সতীশ বল্‌ল, তোমার ভয় কি তুমি ত গল্প বলছ। একটু ভেবে বল্‌লাম, চেষ্টা ক'রে দেখি তোমাদের মনের মত গল্প বল্‌তে পারি কি না। এইবার কিন্তু আমার নিজের ঘরের কথাও কিছু বল্‌তে হ'বে নইলে অচেতন পদার্থের মত আমার গল্প এই খানেই পড়ে থাকবে। এক পাও নড়বে না।

সকলে উত্তেজিত হ'য়ে বলে উঠ্‌ল, তোমার ঘরের কথা কি রকম? নায়িকাটি কি তোমার কোন আত্মীয়া না কি?

আমি বল্‌লাম, আত্মীয়া ত বটেই, তবে ভাই, তোমাদের কাছে সম্পর্কটা ঠিক করে ভেঙ্গে বলতে ভয় পাই। আজ কালকার ছেলেমেয়েদের শালা শালী বল্‌লে তারা সেটা মোটেই বরদাস্ত করে না। বলবার অধিকার থাকলেও জ্যোৎস্না আমার ব্রাহ্মণীর মধ্যমা ভগিনী।

রমেন বলল, কেন শালী বল্‌লে তোমার কর্ণমূলের উপর কোনরকম উপদ্রবের সম্ভাবনা আছে না কি? তা সেও সৌভাগ্য হে।

আমি বল্‌লাম, তা সৌভাগ্য খুব। যে দিন ঐ সম্বোধনটা প্রয়োগ করব, ঠিক তার পরদিন কোর্টে জজের সামনে মকদ্দমা করতে দাঁড়িয়ে My lord পর্য্যন্ত বলে আমার মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। এ আমি Experiment করে দেখেছি।

সকলে জিজ্ঞেস করল, কি রকম?

আমি বল্‌লাম, কি রকম আর কি—সার্টের কলারে তার হাতের আস্তিনের মধ্যে থেকে বেশী নয় অন্তত দু ডজন ছারপোকা এক সঙ্গে আমাকে কামড়াতে থাকবে তখন হাত চুলকাই কি গলা চুলকাই ভাবতে গিয়ে মকদ্দমার বিষয় ভুলে গিয়ে কি যা তা বকে যাব। এখন বুঝলে?"

সকলে বলে উঠল—সর্ব্বনাশ!

তোমাদের এইবার আমার গল্পটা আর একটু ভেঙ্গে বলি। বিশু আর জ্যোৎস্নায় ছেলেবেলায় খুব ভাব ছিল। দুটিতেই সমান দুষ্টু, হুটোপাটি গোলমাল নিয়েই সর্ব্বদা থাকত, আর তা ছাড়া উভয় পক্ষেরই চড়টা চাপড়টা মাঝে মাঝে বিনিময় হতই। তারপর একদিন বিশু গেল কলেজে আর জ্যোৎস্না গেল বোর্ডিং-এ, আর দুজনের মধ্যে বড় একটা দেখা শুনা রইল না। বিশু যেদিন এম, এ পাশ করে কলেজ থেকে বেরিয়ে এল সেদিন তার অনেকখানিই পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে; কিন্তু জ্যোৎস্না সেই দস্যি মেয়েই আছে, কিছু বদলায় নি।

একদিন বিশুর মা'র কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন, বিশুর কি হয়েছে জানি না, সর্ব্বদাই চুপচাপ থাকে, কারুর সঙ্গে মেশে না পড়াশোনাও করে না। তুমি এসে একবার দেখে গেলে ভাল হয়। ইত্যাদি। চিঠিটা প্রায় শেষ করেছি এমন সময় পেছন থেকে ফস্ করে কে সেখানা টেনে নিল। ফিরে দেখি স্বয়ং দেবী। তিনি চিঠিখানি পড়ে টেবিলের ওপর রেখে বললেন, রোগ বড় সাংঘাতিক, রীতিমত চিকিৎসার দরকার। দুষ্টুমির হাসি তার সারা দেহে ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। আমি বল্‌লাম, তাহলে তুমিই ডাক্তার নিযুক্ত কর। সে মাথা নেড়ে বলল, উঁহু, আর একটু ভোগ হওয়া দরকার। এরই মধ্যে তাড়াতাড়ি অষুদ পত্তর দিয়ে রোগ থামালে আবার পাল্টে পড়বার সম্ভাবনা আছে। আমি বললাম, তবে মুশকিল কি জান, একটি ছাড়া দুটি ডাক্তার লাগালেই সব মাটি হয়ে যাবে। ঠিক রোগ বোঝে এমন ডাক্তারই বা কোথায় পাই? সে বলল, তোমার

অত মাথা ব্যথার দরকার কি বাবু ? আমি বল্লাম, বা বেশ ত! আমার মাথা ব্যথা হবে না? সে যে আমার—। গিন্নী বললেন, হৃদয় বন্ধু। তারপর ছোট্ট দুটি আঙুল দিয়ে আমার নাকটি অচ্ছা করে নেড়ে দিল। দুষ্টামির সাজা দেবার জন্যে তার মাথাটা দুই হাতে ধরেছি এমন সময় জ্যোস্না ঘরে ঢুকে বলল, এই যে আবার ভাব হয়েছে দেখছি! বহ্বারম্ভ। সত্যি বলছি মুখুয্যে মশাই, এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আপনি যে কাণ্ড করছিলেন আমি মনে করলাম, আপনি দিদিকে ডাইভোর্স ই করেন বা। তার পর বিপুল উদ্যমে ঘর পরিষ্কার করতে লেগে গেল।

কদিন থেকেই দেখছি জ্যোৎস্নার কেমন একটা পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে। সব কাজ ভয়ানক উৎসাহের সঙ্গে আরম্ভ করে, শেষটা আর কিন্তু কিছুতেই করে উঠতে পারে না। মাঝে মাঝে অকারণে চোখদুটি লাল হয়ে ওঠে—সেদিন ধরা পড়ে, সেটা ঢাকবার জন্যে তাড়াতাড়ি বলে ফেলল, দেখুন ত মুখুয্যে মশাই, চোখটায় বালি পড়েছে'। মনে মনে বললাম, চোখের বালি বড় বিষম জিনিষ ভাই।

রবিবার দিন আমাদের সকলের বিশুদের বাড়ী নেমন্তন্ন ছিল। খাওয়া দাওয়ার পর বিশুর মা বললেন, ডাক্তাররা বিশুকে দিনকতক কোথাও হাওয়া বদলাতে যেতে বলছেন, তা বিশু কিছুতেই রাজি হয় না, কি করি বল ত কমল? আমি বিশুকে বললাম, কি হে, যাও না কোথাও দিন দুই।

সে ভারি গরম হ'য়ে বলল, তুমি ত বললে যাও না, কিন্তু আমি যাই কি করে? ট্রেণের ভিড়, গোলমাল, তা ছাড়া মালপত্তর ওজন, পথে চেঞ্জ, ওসব আমার দ্বারায় হয়ে উঠবে না, আমি বেশ আছি।

তারপর যে কি হয়ে গেল ঠিক আমি বলতে পারি না। রামা চাকর আর উড়ে বামুনের হাতে এই ভবসংসারে আমায় একা ফেলে আমার তিনি বোনটিকে নিয়ে গেলেন পুরী। যাবার সময় অবশ্য একটু ভরসাও দিয়ে গেলেন, কিন্তু সে কথা এখন ভাঙ্গতে চাই না।

সপ্তাহখানেক পরে একখানা চিঠি পেলাম, তোমার ছুটী হলেই এখানে চলে এসো, আর রোগীটিকেও আনতে ভুলো না যেন। ডাক্তার পেয়েছি।

সুরেন আমায় এক ধাক্কা দিয়ে বলল, মিথ্যেবাদী, মোটে ঐ দুলাইন চিঠি পেয়েছিলে?

আমি বললাম, তা হয় ত নাও হতে পারে।

রমেন আমার গা ঘেঁসে বসে কানের কাছে মুখ এনে বলল, কি বলে তোকে সম্বোধন করেছিল বলবি না ভাই?

আমি বল্লাম খুব বল্‌ব, সম্বোধনে শ্রীচরণেষু আর স্বাক্ষরে পূর্ণিমা দিয়ে চিঠি শেষ করেছিল।

সে হতাশ হয়ে একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে বলল, আজ কমল-দা'র ঘাড়ে গন্ধ-ভূত চেপেছে। এমন বাদলাটা মাটি হয়ে গেল, তারপর কাল আবার সোমবার সেই দশটায় আর পাঁচটায়। কেরাণী ভেজান বিষ্টি ত আছেই।

কোর্ট বন্ধ হলে, বিশুকে পুরীতে নিয়ে যাবার জন্যে তার মাকে একদিন বলতে গেছি। গিয়ে দেখি, বিশু চাঁপাকে নিয়ে গভীরভাবে কি আলোচনা করছে। মনে ভাবলাম, হয় ত ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের ভুল ধারণা বা কোন গভীর দার্শনিকতত্ত্ব তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। আমিও চুরি করে উপদেশ নেবার জন্যে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে দাঁড়িয়ে সত্যি সেদিন আমার খুব লাভ হল। এত দিন পরে বিশুর সিদ্ধান্তটা যেন অস্তিত্বের দিকেই ঝুঁকেছে, অবিশ্বাসটা অনেকখানিই যেন কমে গিয়েছে বলে মনে হ'ল। সে তখন চাঁপাকে জিগ্যেস করছিল, সে আর আসে না? চাঁপা বিশুর মুখের দিকে চেয়ে বড় বড় কাল চোখদুটি একটু ঘুরিয়ে বলল—কে, ঝণ্টু?

দূর ঝণ্টু নয়। ঐ যে তোদের গান শেখাত, সেদিন গাইছিল মনে নেই?

চাঁপা এবার বুঝতে পেরে বলল, ও, জ্যোস্নামাসীমা? বাঃ সে কি করে আসবে? সে ত পুরী গিয়েছে। পূর্ণিমা মাসীমাও গিয়েছে।

বিশু চাঁপাকে আরো দু'একটা কথা জিগোস্ করতেই, সে চটে বলল, তোমার সঙ্গে অত বকর বকর করতে পারি না মেজ কাকা। আমার কাজ আছে, ছেলেকে ওষুধ খাওয়াতে হ'বে, কাল জর হয়েছিল। বলে, পাকা বুড়ির মত তার পুতুলটিকে স্নেহভরে বুকে চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ পেয়ে বুঝলাম, রোগের চরম অবস্থা দেখা দিয়েছে।

বিশুকে নিয়ে পুরী এলাম। সেদিন সন্ধ্যাবেলা এক পশলা খুব বৃষ্টি হয়ে যাবার পর, আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। আমার ঘরের জানালা দিয়ে দূরে সমুদ্রের ঢেউগুলি তীরে আছড়ে পড়ছে দেখা যাচ্ছিল। চাঁদের আলোয় সাদা ফেনাগুলি ঠিক যেন কাপাশ তুলো বলে মনে হচ্ছিল। পূর্ণিমার উপর আমি বড় রেগেছিলাম। এমন সুন্দর রাত্রি, এখন গিয়েছেন ভাঁড়ার ঘর গোছাতে। একটুও আক্কেল নেই! তার সঙ্গে মনে মনে জন্মের আড়ি দিয়ে চুপ করে বসে আছি। তন্দ্রায় চোখ দুটি ক্রমেই ভারি হ'য়ে আসছিল। হঠাৎ সে পিঠে একটা টোকা দিয়ে বল্‌ল—চিকিৎসা আরম্ভ হয়েছে, দেখ্‌বে এসো।

আমরা দুজনে একটা থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম। জ্যোৎস্না ছাদের পাঁচিলের ওপর হাত রেখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার ধূপছায়া রং-এর সাড়ী রাত্রির রং-এর সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েছিল। খোলাচুল বাতাসের আঘাতে তার পিঠের ওপর কেঁপে কেঁপে উঠছে। বিশু তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। জ্যোৎস্না নিশ্চয়ই তার পিছনে কেউ দাঁড়িয়েছে এটা টের পেয়েছিল, তার মাথাটি যেন একবার ফিরে দেখবার জন্যে নড়ে উঠ্‌ল, কিন্তু কি ভেবে আবার সে হাতের ওপর মাথা রেখে পাঁচিলের গায়ে হেলান দিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আমরা শুন্‌লাম—জোনা—। সে শব্দটি যেন জ্যোৎস্নায় ঘেরা অন্ধকারের বুকের ভিতর হ'তে বেরিয়ে এল। জ্যোৎস্না কিন্তু ফিরে চাইল না। আমরা আবার শুন্‌লাম—জোনাকী! বিশু জ্যোৎস্নার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। জ্যোৎস্না হঠাৎ মাথাটাকে তুলিয়ে তার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌ল, কি? বিশু বল্‌ল, যদি জান্‌তে যদি বুঝতে;—

জ্যোৎস্না বল্‌ল, আর তুমিও যদি জান্‌তে যদি বুঝতে—আজ দু'বছর কেবল পরীক্ষায় ফেল হচ্ছি, এবার আর আমি পড়ব না ঠিক করেছি।

ঘরে এসে পূর্ণিমাকে বল্‌লাম, জ্যোৎস্না আজ যে অভিনয়টা করল আমার মনে হয় এর পূর্ব্বে ওর রিহিয়ার্শেল দেওয়া ছিল।

পূর্ণিমা আমায় ঠেলা দিয়ে বল্‌ল, পাগল! আমি বল্‌লাম, বিশ্বাস হচ্ছে না? পূর্ণিমা রেগে বল্‌ল, জান ও আমার বোন্।

আমি পূর্ণিমার মাথাটা সবে একটু কাছে টেনে এনেছি এমন সময় জ্যোৎস্না ছুটে ঘরে এসে ঢুকল। তার কান মুখ একেবারে লাল!—

গল্প শেষ হতে সকলকে বল্‌লাম, কেমন লাগল?

সকলে বল্‌ল,—ছাই গল্প। এর চেয়ে আপিসে যাবার সময় যখন ডেকে বলি, ওগো ভাত হ'ল? আর তিনি দমাস্ করে তরকারীর কড়াটা মাটিতে নামিয়ে বলেন, এই আমাকে খাও—তা ঢের মিষ্টি।
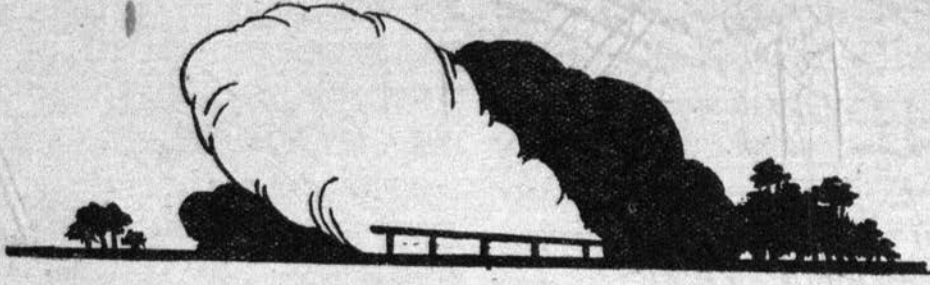
সমাজ-দ্রোহী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

১

জীবনের পথ বেয়ে চলবার কালে একদিন হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল।

আজ সেদিন সুদূর অতীতে মিশে গেছে, কিন্তু সেই পথে-চলার দাগটা যে মনের মধ্যে এঁকে গেছে তা আর মিশায় নি, বোধ হয় কখনো মিশাবেও না।

সে দিনের কথাটা আজও খুব উজ্জ্বল হয়ে মনে জেগে আছে, যদিও তার পর আরও অনেক দিনই দেখা হয়েছিল কিন্তু সে দিনকার মত মনে দাগ এঁকে দিয়ে চিরকাল জাগিয়ে রাখতে আর কোন দিনই সমর্থ হয় নি।

সে দিন সে মেয়েটি ছিল তরুণী, বোধ হয় বছর তের চৌদ্দ তার বয়স হবে। সাজিটি তার ফুলে ভরে নিয়ে সে চলেছিল পথ দিয়ে, আমি বিপরীত দিক দিয়ে আস্‌ছিলুম। আমায় দেখে সে একটুও সঙ্কুচিত হয় নি, বেশ সঙ্কোচহীন ভাবে সে একটু পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল, সঙ্কোচ-হীন চোখে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

তরুণীর চোখের সঙ্গে আমার চোখ মিলে যেতে লজ্জায় আমারই মাথাটা যেন নুইয়ে পড়ল। আমি থমকে দাঁড়ালুম, পথটা বড় সঙ্কীর্ণ ছিল, যদিও সে পথ ছেড়ে একটু পাশে দাঁড়িয়েছিল তবুও পথের পানে তাকিয়ে আমার মনে হল, এ পথ বেয়ে, চলতে গেলে তার স্পর্শ আমায় অনুভব করতে হবেই। তার সাজির পানে নজর পড়ল, মনে হল—ফুল এমনি হাতেই মানায় বটে, মনে হল—এ ফুল দিয়ে কি হবে, মালা গাঁথা—না দেবপূজা?

এক মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়িয়ে থেকে আমি ফিরছিলুম, সে একটু হেসে বললে, ফিরে যাচ্ছেন কেন, এখান দিয়ে যেতে পারবেন না?

আশ্চর্য্য হয়ে আবার ফিরতেই তার সেই আশ্চর্য্য চোখ দুইটির পানে আমার দৃষ্টি পড়ল, ভাবলুম মেয়েটি লজ্জা কাকে বলে তা আজও শেখে নি, তার নিটোল গাল দুটি লাল হয়ে উঠেছিল,—সে কি লজ্জায়?

পুরুষত্বের অহঙ্কারটা মনে জেগে উঠল, তাই তো; ফিরে যাব কেন একটি ছোট্ট মেয়েকে দেখে? সে তো পাশ দিয়েছে, চলে যেতে আমার বাধাটা কি?

এগিয়ে পড়লুম। তার পাশ দিয়ে যেতে একটি

সুন্দর গন্ধ আমার কাছে ভেসে এল, আমার মনটা কেন অকস্মাৎ ভরে উঠল; কাছ দিয়ে যেতে আমি আবার তার পানে চেয়ে দেখলুম, সে প্রাণপণে তার দৃষ্টিকে সংযত করে অন্য দিকে ফিরিয়ে রেখেছে।

একটু তফাতে এসে দেখলুম মেয়েটি পথের মাঝে দাঁড়িয়ে; দৃষ্টি তার কোন অনির্দ্দিষ্ট পথে বদ্ধ করে এক-পা দু-পা করে চলেছে।

২

আর দুই একবার দেখা হতেই পরিচয়টা বেশ গাঢ় হয়ে উঠল।

বড় অস্থির দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির মেয়ে ছিল সে, এতেই সে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সে তার বাইরের খেয়ালটাকে নিয়েই মশগুল থাকত, অন্তর-রাজ্যে যে বিপ্লবের শুরু হয়েছে সে খবর তখনও তার কাছে গিয়ে পৌছায়নি, সে তখনও কোমরে কাপড় জড়িয়ে অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই পথে দৌড়ায়, গাছে ঢিল ছোঁড়ে, পুকুরে সাঁতার কেটে জল তোলপাড় করে।

চিরকাল তার বাপ থাকতেন বিদেশে, স্ত্রী-কন্যাও তাঁর কাছে ছিল। তিনি মারা যেতে তারা আজ মাস দুই তিন দেশে এসেছে মাত্র, এরই মধ্যে মেয়েটি তার অসাধারণ কাজের জন্যে সকলের কাছেই পরিচিত হয়ে গেছে। আমি গ্রীষ্মের বন্ধের পরে এ কয় মাস কলেজ ছেড়ে ছিলুম, তাকে এই প্রথম দেখতে পেলুম।

সত্য কথা বলব—তার এই দুষ্টুমীটুকু আমার বেশ ভাল লাগত। প্রথম সে আমার সঙ্গে বেশ ভদ্র ভাবেই চলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মানুষের প্রকৃতি নাকি বাহ্য আড়ম্বরে ঢাকা দেওয়া যায় না, কখনো না কখনো তা প্রকাশ হয়ে পড়বেই,—শুধু এই জন্যই তার স্বভাব চাপা দেওয়া থাকল না, তার দুষ্টুমী ক্রমেই প্রকাশ হয়ে পড়তে লাগল।

বাইরের থেকে এবার সে ভিতরে আমার পড়ার ঘরে পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করল। আমি পড়তুম, কারণ পরীক্ষা সামনে এসেছে, এখন আর পড়ায় ঔদাস্য সাজে না, অবশ্য যদিও আগে—কিছু কষ্ট হয় বলে পড়ায় হেলা করেই এসেছি। রেণু প্রথমটা আশ্চর্য্য হয়েই দেখত, অনেকবার জিজ্ঞাসাও করেছে আমি এত বড়—আমার আবার পড়তে হয় কেন। প্রথম বেশ ভাল ভাবেই উত্তর দিয়েছি, শেষকালে আর তার অনাবশ্যক প্রশ্নের উত্তর দিতুম না।

বেশীক্ষণ শান্ত হয়ে থাকা তার প্রকৃতিতে পোষাত না, ক্রমে সে আমার পড়ার টেবিলেও উপদ্রব আরম্ভ করে দিলে।

মা বিরক্ত হয়ে বলতেন, মেয়েটাকে অতটা আদর দিয়ে কেন মাথায় তুলছিস মহিম, অমন দুষ্টু মেয়ে দুনিয়ায় যদি আর একটা দেখা যায়।

আমি একটু হাসতুম, কিন্তু সহস্র উপদ্রব করা সত্বেও তাকে কড়াকথা বলে তাড়াতে পারতুম না। সকাল বেলা হতেই সে সকালের আলোর মতই এক ঝলক হাসি ছড়িয়ে ছুটে আসত, আমাকে তখন তার মুখের পানে একটু খানির জন্যেও তাকাতে হতো।

ছুটি ফুরিয়ে গেলে আমি যখন কলকাতায় যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিলুম সেদিনও সে তেমনি হাসি মুখে আমার ঘরে এসে ঢুকেছিল। আমি বইগুলো গুছোচ্ছি দেখে সে অবাক হয়ে গিয়ে বললে, বই গুছোচ্ছ কেন মহিম-দা?

আমি বললুম, আজ যে কলকাতায় যাচ্ছি।

এক মুহূর্ত্তে সে যেন নিভে এল, মুখখানা তার বিবর্ণ হয়ে গেল, একটু থেমে একটা ঢোঁক গিলে সে জিজ্ঞাসা করলে, কলকাতায় গিয়ে কি করবে?

আমি বললুম, পড়ব, পাশ করতে হবে যে।

সে অবুঝের মত বললে, পাশ করে কি হবে?

আমি বললুম, মানুষ হব।

অবাক হয়ে গিয়ে সে বললে, পাশ না করলে বুঝি মানুষ হয় না?

তাকে বুঝাতে গেলে অনেক কথা বলার দরকার, তাই আমি খুব সংক্ষেপে বললুম, না।

সে খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল, তারপর কখন যে নিঃশব্দে উঠে চলে গিয়েছিল তা আমি জানতে পারি

নি, পিছন ফিরে আমি তাকে আর দেখতে পেলুম না। বাইরে মা'র তর্জ্জন গর্জ্জন শুনতে পেলুম, তিনি কাকে বকছেন—পোড়ারমুখী, চোখে যেন দেখে-শুনে হাঁটতে পারে না, দস্যি মেয়ে বাবা, এ মেয়ে যার ঘরের বউ হবে তার ঘরে কখনো লক্ষ্মী হবে না। মাগো মা, বোতল গুলো সব পা দিয়ে ফেলে ভাঙলে, তেল পড়ে ভেসে গেল। দূর্ হ আপদ, আবার যদি এ বাড়ী-মুখো হবি তো ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়ব।

বেশ বুঝতে পারলুম ব্যাপারখানা কি, তাই আর উঠলুম না, দেখলুমও না।

সেই দিনই আমি কলকাতায় চলে গেলুম।

৩

কয়টা দিন একজামিনের ভাবনায় এত ব্যস্ত ছিলুম যে, মেয়েটির কথা মোটেই মনে হয় নি। একজামিন মিটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কথা আমার মনে অতর্কিতে কখন জেগে উঠল।

সেবার যখন বাড়ী গেলুম তখন চঞ্চল সে মেয়েটিকে আর আসতে দেখলুম না। শুনলুম তার নাকি বিয়ের কথা হচ্ছে। মা উপসংহারে এই বললেন, বাবাঃ, যে মেয়ে, গাঁ সুদ্ধ সবাই জানে ও-মেয়ে যার ঘরে যাবে তার ঘরে লক্ষ্মী থাকবে না, তাই যে কেউ মেয়ে দেখতে আসছে সেই জবাব দিয়ে যাচ্ছে। ও-মেয়ের বিয়ে হওয়াই ভার—এ সত্যি কথা।

তার বিয়ের কথা শুনে সত্যি বুকের মধ্যে কি রকম একটা ছোটখাট আঘাত পেলুম।

সে দিন বিকালে বেড়াতে যাচ্ছিলুম, পথেই তার মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তিনি অনেক করে বলে আমায় তাঁদের বাড়ী টেনে নিয়ে গেলেন। সত্য কথায় বলতে দোষ নেই, আমারও একবার সে চঞ্চল দস্যি মেয়েটিকে দেখবার ইচ্ছা ছিল, নইলে কখনই যে যেতুম না তা সেও জানত।

মায়ের আদেশমত রেণু একখানা আসন পেতে দিয়ে গেল, দেখলুম তার মুখখানা বড় কঠিন হয়ে গেছে, সে ভাল করে আমার দিকে চাইলে না, আমার সঙ্গে একটা কথাও বললে না।

তার মা অনেক কথা বললেন, রেণুর বিয়ের সম্বন্ধ অনেক জায়গা হতে আসছে, অনেকে পছন্দও করেছে কিন্তু গাঁয়ের লোকের কথা শুনে শেষকালে সবাই জবাব দিচ্ছে। মেয়েও এদিকে প্রায় পনের বছর বয়েস হতে চলেছে, বিধবা আত্মীয়-স্বজনবিহীন তিনি, এ অবস্থায় কি করবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না, তাই আমার কাছে পরামর্শ চান; কেন না আমি তাঁর শিক্ষিত আত্মীয়; যদিও আত্মীয়তাটা গ্রাম সম্পর্কীয়ই।

আমি বেশ লম্বা চওড়া এক লেকচার দিলুম,—বেশ তো, বিয়ে না হয় ক্ষতি কি? সবারই যে বিয়ে করতে হবে এমন তো কোনও কথা নেই। আজকাল দেশের যে রকম অবস্থা তাতে কতকগুলি কুমার কুমারীর দরকার,—যাদের কোনদিকে আকর্ষণ থাকবে না, তারা প্রাণ ঢেলে দেশের কাজ করবে। রেণুর যদি বিয়ে না হয়—থাক্, তার দ্বারা অনেক কাজ হবে।

বিধবা আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে বললেন, তাও কি হয় বাবা; আমাদের দেশের সমাজ সব অনাচার সইতে পারে, মেয়েকে কুমারী রাখার প্রস্তাব কখনো সইতে পারবে না; তা হলে আমায় 'একঘরে' করবে।

তরুণ বুকের রক্ত তখন বড় গরম, উত্তেজিত হয়ে বললুম, হলেনই বা সমাজচ্যুত তাতে কি?

তাতে কি? বিধবা একটু হাসলেন মাত্র। পরে বললেন, বাবা, এ দেশের পুরুষদের যখন সে সাহস নেই, দরিদ্র আত্মীয়হীন বিধবা হয়ে আমি সে সাহস করি কি করে, ভাব দেখি? মেয়ে আমার দুষ্ট, এই মাত্র তার অপরাধ, এর জন্যে যে দেশের লোক তাকে ঘরে নিতে চায় না, মেয়েকে কুমারী রাখলে কি তারা চুপ করে থাকবে? বাবা, আমি তোমায় ডেকেছি, জানি তুমি ওকে ভালবাস, সকলের মত ওকে ঘৃণার চোখে দেখ না, তুমি যদি দয়া করে ওকে গ্রহণ কর—

আমি হঠাৎ এতটা চমকে উঠ্'লুম যাতে বিধবাও সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন, জড়িতস্বরে কি যে তিনি বললেন, তা বুঝতে পারলুম না।

মনটা ঠিক বুঝি এই-ই চাচ্ছিল, কিন্তু কি করে তা

হবে, হওয়ার উপায় নেই যে। তাঁরা দক্ষিণ রাঢ়ি কায়স্থ, আমরা উত্তর রাঢ়ি, জানি এই হ'চ্ছে প্রধান কারণ, তারপর—সে যে খ্যাতি অর্জ্জন করেছে তাতে প্রস্তাব করলেই মা তাড়া করে আসবেন।

আমি মাথা নাড়লুম, জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বললুম, তাও কি হয় কাকি-মা?

তিনি তবু জোর করে বললেন, কেন হবে না বাবা? এই সমাজের ওজর করবে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি—এই সমাজের কাছে থেকে তোমরা কতটুকু পেয়েছ আর কতখানি পাবে! যে সমাজ অধীনতায় পূর্ণ হয়ে গেছে সে সমাজের সংস্কার আবশ্যক কিনা তা বিবেচনা করবে তোমরা—কেন না তোমরা শিক্ষা পেয়েছ। বাবা,—মানুষের জন্যে সমাজ সৃষ্টি হয়েছে—না সমাজের জন্যে মানুষ সৃষ্ট হয়েছে তাই আমি জিজ্ঞাসা করছি। আমি জানি, তুমি রেণুকে ভালবাস কিন্তু তাকে গ্রহণ করতে পারবে না সে শুধু সমাজের জন্যে, তোমার সমাজ তোমার নির্ব্বাসন দেবে বলে তাই। মানুষের মন তা হলে কিছুই নয়, তাকেও এই ঈর্ষাপ্রসূত সমাজের আইনে দলিত পেষিত হতে হবে? আমি বলি,—সমাজের চেয়ে মানুষ বড়, মানুষের ইচ্ছা বড়। ব্যর্থতা বুকে ধরে সমাজের কোলে বাস করে চিরকাল হাহাকার করার চেয়ে সফলতাকে বরণ করে এমন সমাজের বুকে নতুন ভাবের প্রেরণা জাগিয়ে তোলা শিক্ষিতেরই কাজ। আমি তোমার কাকি-মা, গুরুজন হয়েও অনেক কথা তোমায় বলছি, কিন্তু এ গুলো দূষনীয় নয়, আমি তোমার শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে চাচ্ছি। ভালবাসা জিনিষটা হেয় নয় মহিম, প্রকৃত প্রেমিক একেই স্বর্গ বলে উল্লেখ করতে পারেন। এই ভালবাসার জন্যে প্রকৃত প্রেমিক আর সবই ত্যাগ করতে পারেন, সেটা দোষাবহ নয়, সেইটাই প্রকৃত। এই সমাজের শাসনে এমন ঢের নর-নারী আছে যারা মিলতে পারে নি, তাদের জীবনটাই তারা ব্যর্থ মনে করে। অথচ তারা যে নিজের নির্দ্দিষ্ট কাজ না করে যাচ্ছে তা নয়, কিন্তু তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন নেই। মহিম, এমনি ব্যর্থতা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে—এমন ভাবে সমাজের পায়ে সব বিসর্জ্জন দিয়ে বাঁচার চেয়ে একেবারে মরে যাওয়া ভাল, না এমন সমাজকে চূর্ণ করে দেওয়া ভাল? হতাশ হয়ে মরে সবাই, মরেছেও অনেকে, তাতে সমাজের তো কিছু হয় নি। তাই বলছি, মরেও মরার সার্থকতা নেই যখন, তখন বেঁচে থেকে যাতে এমন নিরাশ আর কেউ না হতে পারে তারই চেষ্টা কর, নতুন সমাজ সৃষ্টি কর।

কথাগুলা যথার্থ সত্য, সামান্য একটি নারীর মুখে এমন সতেজ কথা শুনবার আশা আমি কখনই করি নি, বিস্ময়ে আমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। কথাগুলো ঠিক আমার অন্তরে গিয়ে আঘাত করেছিল, কিন্তু কোন কোনও লোকের দুর্ব্বলতা যেমন বেশী থাকে আমারও তেমনি ছিল বলেই আমি মৃদুকণ্ঠে বললুম, আপনি মা'র কাছে কথাটা বলবেন কাকি-মা, আমার কাছে—

তীব্র একটু হাসির আভাস রেণুর মায়ের মুখে ভেসে উঠল, তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, ভাল কথা, কিন্তু এটা তো ঠিকই জানা কথা, তোমার মা কখনই আমার মেয়েকে গ্রহণ করতে পারবেন না। নিজেকে এই সমাজেরই পায়ের কাছে বলিদান দিচ্ছো—দাও, কিন্তু বাবা, হয় তো একদিন তোমায় এরই জন্যে অনুশোচনা করতে হবে।

উঠে পড়লুম, এর পর আর সেখানে থাকবার শক্তি যেন ছিল না।

কথাটা ভাববার মত; কিন্তু কাজে পরিণত করতে যে সাহস দরকার সে সাহসটুকু আমার কই?

৪

একটা কাজের ওজর করে পরদিনই আমি কলকাতায় পালালুম। আমাদের একটা ক্লাব ছিল, ইচ্ছা ছিল ক্লাবে এই কথাটা বলে আমার নব্যতন্ত্রের বন্ধুদের মতটা নেব, তারপর এগিয়ে যাওয়া অথবা পেছিয়ে পড়া আমার ইচ্ছাধীন।

আমার যাওয়ার কয়দিন পরেই মা'র পত্র পেলুম—রেণুর বিয়ে হয়ে গেল, কলকাতাতেই তার স্বামীর বাড়ী, সেখানে তাকে নিয়ে গেছে। আশ্চর্য্য কথা, রেণুর বিয়ের আগের দিন রেণুর মা রেণুর সঙ্গে আমার বিবাহ প্রস্তাব

নিয়ে মা'র কাছে গিয়েছিলেন, অনেক নতুন কথাও শুনিয়েছেন, মা তাঁর স্পর্দ্ধা দেখে খুব রাগ করে যা তা বলে বিদায় দিয়েছেন।

আমার মনে রেণুর মায়ের কথাগুলো জেগে উঠল, রেণুর কথা মনে হল, বেদনাদীর্ণ বুক চেপে চুপ করেই রইলুম।

সে দিন আমাদের ক্লাবের অতুল মিত্র অনেকদিন বাদে ফিরে এসেছে। শুনলুম সে বিয়ে করে এসেছে, তার স্ত্রী স্বজাতির মেয়ে নয় বলে দেশের সকলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে সে চলে এসেছে।

আমার বুকটা আচম্‌কা চম্‌কে উঠল। অতুল চেয়েছে প্রেমের দিকে, সে তার যথা সর্ব্বস্ব হারিয়েও যে তার প্রিয়তমাকে কাছে পেয়েছে এই পাওয়ার নেশায় ভরপুর, অন্য কষ্ট তাকে এতটুকু ব্যথা দিতে পারে নি, কিন্তু আমি?—

কতবার দেশে গেলুম, রেণুকে আর দেখতে পাই নি। তার মা মারা গেছেন, দেশের সঙ্গে তার সকল সম্পর্কই মিটে গেছে।

মা আমার বিয়ে দেওয়ার জন্যে অনেক চেষ্টা করছিলেন কিন্তু বিয়ে করবার প্রবৃত্তি আমার আর ছিল না। মানুষের জীবনে বিয়ে একবারই হয়ে থাকে, জন্ম মৃত্যু যেমন দুবার হয় না, বিয়েও তেমনি দুবার হয় না বলে আমার মনে ধারণা জন্মেছিল। হাতে পেয়ে তাকে ঠেলে দিয়েছি ; এই পেয়ে-হারানোর ব্যথাটা আমার বুকে দিনরাত কাঁটা বিঁধাত। আমি কিছুতেই বিয়েতে মত দিতে পারলুম না।

মা চোখের জলে ভেসে জানতে চাইলেন, কেন আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি নে। উত্তরে হেসে বললুম, এমনি, নিজের ইচ্ছামত মা, বিয়ে করতে যথাই আমার ইচ্ছে নেই।

তারপর বহুকাল কেটে গেছে ; আমি এখন বৃদ্ধ, আমার দেহের যৌবন গেছে কিন্তু অন্তরের তরুণ ঘুমায় নি, আমার অন্তরে আজও রেণু জেগে আছে। আমি অসার জীবনের এতকালের মধ্যে আর তার খবর পাই নি। তার নাম হয় তো সবাই ভুলে গেছে, কিন্তু আমার মনে সে এখনও জেগে, এখনও সে সেই তরুণী মূর্ত্তিতে পথের ধারটিতে ফুলের সাজিটি হাতে নিয়ে যেন আমারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে।

আমার মাথার কাল চুল সব সাদা হয়ে গেছে, চলতে পা কাঁপে,—এমনি সময়ে একদিন নিমেষের জন্যে দেখা পেয়েছিলুম, সে-ই শেষ দেখা।

গঙ্গার ধারের পথ দিয়ে আসছি, একটি মেয়ে আমায় ডেকে বললে, একটু এদিকে আসুন, আমার মনিব ঠাকরুণ আপনাকে ডাকছেন।

আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম, কে তার মনিব ঠাকরুণ তাও তো চিনি নে। ভাবলুম, আমায় ব্রাহ্মণ ভেবে মেয়েটি হয় তো গঙ্গাস্নানান্তে দান দেবেন, তাই ডাকছেন। আমি বল্লুম, বাছা, আমি বামুন নই, কায়স্থ। তোমার মনিব ঠাকরুণকে গিয়ে জানাও, আমি তাঁর দানের অপাত্র।

মেয়েটি ছাড়লে না, বললে, তিনি দান নেওয়ার জন্য আপনাকে ডাকছেন না, অন্য কি দরকারে ডাকছেন।

তাকে কিছুতেই ছাড়াতে না পেরে তার সঙ্গে গেলুম, একটি পাশে জনহীন স্থানে একটি রমণী দাঁড়িয়েছিল, মুখে তার অল্প ঘোমটা। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই সে গায়ের কাপড়ের নীচে থেকে তার শুভ্র হাত দুখানি বার করে একটা ঠোঙ্গা ভরা কলা সন্দেশ প্রভৃতি আমার পায়ের কাছে রেখে গলায় আঁচলটা জড়িয়ে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিলে।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, একি করলেন, আমি ব্রাহ্মণ নই, কায়স্থ।

সে তার মুখের ঘোমটা তুলে ফেললে, শান্ত চোখের দৃষ্টি আমার মুখের 'পরে ফেলে বললে, জানি তুমি বামুন নও কায়স্থ, তোমায় বামুন বলে মনে করে দিই নি, কায়স্থ জেনেই দিয়েছি।

তার মুখের পানে তাকিয়ে আমি চম্‌কে পেছনে সরে গেলুম, রেণু—

কান্নাভরা স্বরে প্রৌঢ়া রেণু বললে, হ্যাঁ, আমিই রেণু। আজ চিনতে পারছ কি মহিম-দা কিন্তু এক দিন চিনতে পার নি। কতদিন ইচ্ছা হয়েছিল, তোমাকে একখানা পত্র

লিখি, কিন্তু তোমায় একটা খবর দেওয়ার ইচ্ছাও আমার হয় নি। জীবনের অনেক ভুল শোধরান যায় মহিম-দা, কিন্তু সবগুলোই কি শোধরান দরকার?

বুকটার মধ্যে বড় ধড়ফড় করছিল, বিকৃত স্বরে উত্তর দিলুম, না রেণু, এমন এক একটা ভুল আছে যা করে ফেলে তার প্রায়শ্চিত্ত সারাজীবন ধরে করতে হয়।

রেণু গলা পরিষ্কার করে বললে, হ্যাঁ, তুমি তা করছ সে খবর আমি নিয়েছি, কিন্তু এ প্রায়শ্চিত্ত করার কিছু কারণ ছিল না মহিম-দা, তুমি—

আমি ভারি স্বরে বললুম, পেয়ে হারানোর ব্যথা তুমি বুঝতে পারবে না রেণু, সে ব্যথা যে হারায় সে-ই পেয়ে থাকে। তুমি কোথায় থাক রেণু, তোমার বাড়ীর ঠিকানা কি?

রেণু মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছছিল, শ্লেষ কণ্ঠে বলে উঠল, সে খবরে তোমার কি দরকার?

থতমত খেয়ে গেলুম, না, তোমার স্বামী—

রেণু আবার মুখ ফিরালে,—তিনি নেই, বিয়ের পাঁচ বছর বাদে আমার একটি মেয়ে হওয়ার পরেই তিনি মারা গেছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, নিজের কর্ত্তব্য তারপর পালন করে গেছ ঠিকমত করেই কি?

সগর্ব্বে গ্রীবা উন্নত করে সে বললে, ঠিকমত করে কি না সে কথা তোমার জানবার দরকার নেই মহিম-দা। যে দিন অতীতে মিশে গেছে তা নিয়ে আমি নাড়াচাড়া করতে চাই নে। তুমি পুরুষ হয়ে তখন যা করতে পেছিয়ে গেলে, তার প্রায়শ্চিত্ত তুমি যে ভাবে করেছ আমায় তার শতগুণ কষ্ট সয়েও করতে হয়েছে এটুকু জেনো। যাক মহিম-দা, সে সব কথা এখন থাক্, বড় ইচ্ছা ছিল—জীবনে আর একদিন যেন তোমার দেখা পাই, ভগবান আমার সে সাধ পূর্ণ করেছেন। এই বাসনা থাকার জন্তে আমি মরণের কোলে কতবার গিয়েও ফিরে এসেছি, এবার আমার ঈপ্সিতকে লাভ করতে পারব, আমার সকল বাসনাই মিটে গেছে।

দিদি-মা গো—

একটি চার পাঁচ বছরের সুন্দর ফুটফুটে শিশু দৌড়ে এসে রেণুকে জড়িয়ে ধরলো। রেণু নীচু হয়ে তার শুভ্র ললাটে একটা চুমো এঁকে দিয়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, কি দাদা, ভয় পেয়েছ? এঁকে প্রণাম কর, ইনি তোমার দাদা-মশাই হন।

শিশুটি দুই চার বার সন্দিগ্ধ চোখে আমার পানে চেয়ে পায়ের ধুলো নিতে যাওয়া মাত্র আমি তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলাম, আমার চোখের জল ঝর ঝর করে শিশুর মাথায় ঝরে পড়ল। রেণুও তখন ফিরে দাঁড়িয়ে চোখ মুচ্ছিল।

নাতিকে নামিয়ে ঝির কোলে দিয়ে সে আবার আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, চললুম, আর দেখা হবে না, এই শেষ।

আমি কথা বলতে গেলুম, পারলুম না। শুন্‌লাম, চলতে চলতে শিশু জিজ্ঞাসা করলো, দিদি, ঠাকুর দেখলে না?

রেণু উত্তর দিলে আমার ঠাকুর দেখা হয়ে গেছে দাদা-ভাই, আর দেখতে আসব না।

আমি এর পরে কয়দিন সে ঘাটে গিয়েছিলুম সত্যই, রেণুকে আর দেখি নি।

একদিন সেই ঝি-টিকে দেখতে পেলুম। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, এখান হতে ফিরে গিয়েই মা-ঠাকরুণের ব্যারাম হয়েছিল, মাথার না বুকের কি বলে—দশ এগার দিন পরে তিনি মারা গেছেন!

দুই ফোঁটা চোখের জল উপছে পড়ল, লোকান্তর-বাসিনীর উদ্দেশ্যে—সে কি নেবে না এ অর্ঘ্য? জীবনের পূজা সারা হয় নি, পূজার সাজ তারও ব্যর্থ পড়ে ছিল, আমারও ব্যর্থ রয়ে গেছে।

আমি ভাবতাম, আমি সমাজদ্রোহী। প্রাচীনের দল আমাকে সহ্য করতে পারতেন না। তরুণের দল আমার অন্তরের বিদ্রোহের ভাষা বুঝতে পারত না। মুখের কথায় তারা যতটুকু প্রেরণা পেত, আমার মন বলত, এতে হবে না। এতে তাদের বুকে আগুন ধরবে, সমাজের ঘন-বনে এর আঁচ গিয়ে পৌছুবে না। বুঝি শুধু বলিদানে নয়, আপন শক্তিকে উচ্চতর আদর্শের জন্য উদ্বোধিত করাও বুঝি প্রয়োজন।

বেদে

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মুক্তা

দরজাটা খোলাই ছিল। তবু সে ঘরে আলোকের পলকটিও পড়ে না। জমিদার বাড়ীর উঁচু পাঁচিলটা ডিঙিয়ে আস্‌তে আস্‌তেই রোদের হাঁপ ধরে যেন; ঝিমোয়। তারপর মাড়োয়ারিদের বেঢপ্ ভুঁড়িরই মতো হাসপাতালের মোটা গম্বুজটা রোদকে শুধু আড়াল ক'রে আট্‌কেই রাখে না, চেপ্‌টে, ওর টুঁটিটা যেন টিপে ধরে। ওটার কবল এড়িয়ে এসেই ও একেবারে ভীতু রোগা ছেলের মতো সন্ধ্যার বুকে মুখ রেখে জিরোয়,—অন্ধকারের চোখের জলে গলে' গলে' পড়ে তারপর।

কিন্তু ঐ ঘরে ওর চিরকালের কবর—

মরা মানুষের বোঁজা চোখদুটো জোর করে' ঠেলে খোলাও যেম্‌নি, তেম্‌নিই ঐ ঘরের জান্‌লা খোলা।

রোদ আসে না। যে রোদে শুক্‌নো বনে আগুন লাগে আচম্‌কা, মজুররা যে রোদে উপুড় হয়ে পিঠ পেতে রাস্তা খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। একটি ছিটেও না।

ডাক্‌লাম—দীনবন্ধু! পাইপ্ নিয়ে বেরোলি না যে এখনো?

ভোর হয়ে গেল, এখনো দীনবন্ধু ঘুমুচ্ছে কি রকম? বহুকষ্টের টিম্‌টিমে চাক্‌রিটাও খোয়াতে চায় বুঝি?

তক্ষুনিই চীৎকার করে' উঠ্‌তে হোল—পুত্‌লি, ও পুত্‌লি, শিগ্‌গির আয়,—শিগ্‌গির।

হাতে করে' একটা জলন্ত কুপি নিয়ে পুত্‌লি দৌড়ে এল।—কী, কী?—

ক'টা কুপি একসঙ্গে জ্বালিয়ে আকাশের সূর্য্য,—কে তার হিসেব রাখে?

পুত্‌লি হাতের কুপিটা মাটির ওপর উল্টে' ছুঁড়ে' ফেলে', গলার সমস্ত রগ্‌গুলি চিরে' চিরে' ছিঁড়ে', বুকের পাঁজ্‌রাগুলি চৌচির করে' ফাটিয়ে চীৎকার করে' উঠ্‌ল। মানুষের অভিধানে সে চীৎকারের ভাষা নেই। যেমন নেই সমুদ্রের অগাধ বন্যার, যেমন নেই কালবোশেখীর।

অকালে ঘুম ভেঙ্গে সবাই হুড়্‌মুড়্ করে' ছুটে এল

ভয় পেয়ে; লাঠি সোটা যা হাতের কাছে পেল তাই নিয়ে —হাবুল গণেশ ভজুলাল; ময়লা ছেঁড়া কাপড়টা গায়ের ওপর গুছোতে গুছোতে ও বস্তি থেকে নির্ম্মলা পর্য্যন্ত, হাতে একটা কালি-পড়া টিনের লণ্ঠন। ঘুম ভেঙে কেবল এল না কোনো ফাঁকে কৃপণ আকাশের এক বিন্দু রোদ,— এক চিল্‌তে।

ঘরের লম্বালম্বি বাঁশটায় একটা নারকেলের দড়ি খাটিয়ে তাতে গলাটা এঁটে বেঁধে দীনবন্ধু ঝুলছে।

ওর কোমরের ছেঁড়া পিঁজে-যাওয়া পচা কাপড়ের টুকরোটায় বেড় তো হোতই না, ভারও সইত না;—তাই বুঝি নারকেলের দড়ি কিনে এনেছে। দড়িটা নতুন।

সবাই ধরাধরি করে' নামালাম। নেই।

নির্ম্মলা লণ্ঠনটা ওর মুখের কাছে এনে ধরল। দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভটা বেরিয়ে পড়েছে। যেন লজ্জায় জিভ্‌ কাটছে ও।—কাপুরুষতার লজ্জায়, না-খেতে পাওয়ার লজ্জায়।

মাথার একরাশ জট্‌ পাকানো রুক্ষ চুলের মধ্যে উকুনগুলি পর্য্যন্ত বেঁচে আছে।—ওরাও বাড়ী বদল করবে এবার। প'চো বাড়ী ছেড়ে ভালো বাড়ীতে।

সব্বার আগে, আগে ছিল জল;—বিধাতা একলা বসে' বসে' যত কেঁদেছিলেন, সেই কান্নার সমুদ্র। তারপর সেই কান্নার মর্ম্ম ছেনে' সুশীতল সান্ত্বনার মতো মাটি জন্মালো,—সুকোমল, সহিষ্ণু।

সেই মাটি আজ কঠিন, পাষাণ হয়ে গেছে। ওরা মাটিকে বেঁধেছে। পিটছে, বিঁধছে, চাব্‌কাচ্ছে,— নিরহঙ্কার, নিরলঙ্কার, নির্ব্বাক মাটি।

ঝুড়ি করে' মাটি বিক্রি হয়। এক এক ঝুড়ি এক এক পয়সা। মাটির দরে আরো অনেক কিছু;—মনুষ্যত্বও।

ট্রাম চলে।

বিধাতার বিদ্যুৎকে ওরা লোহার তার দিয়ে বেঁধেছে, —বিনা মেঘের বিদ্যুৎ। যে বিদ্যুৎ বিধাতার অকারণ অভিসম্পাতের মতো গরীবের খড়ের ঘরেই পড়ে, যে বিদ্যুতে সোনাপুকুরের ধারের খেজুর গাছের সারগুলি পুড়ে খাখ্‌ হয়ে গেছ্‌ল—মহান্‌ গয়লা সারা বচ্ছর ফ্যা ফ্যা করেছে।

ট্রাম চলে। লোহার লাইনের ওপর দিয়ে লোহার চাকা ঘষ্‌ড়ে ঘষ্‌ড়ে—

মাটির বুকে এই লোহার ভার। সব লাল লোহু যেন জমে' জমে' কালো লোহা হয়ে গেছে।

ডিপো থেকে লাষ্ট, নাম্বার লিখিয়ে নিয়ে—ছুটো ঘণ্টা দিই। ট্রাম চলে। 'টালি' ধরে' চেয়ে থাকি। আর ভাবি।

সবাই ওকে খেপাত, বল্‌ত—কি সারা দিন রাত্তির খালি নিজের নাম আওড়াস্‌!

দীনবন্ধু ছাতা-পড়া দাঁতগুলি বের করে বল্‌ত,—যে বেচে আমার এমন নাম রেখেছে তার খুরে পেন্নাম হই, বাবা। পরের দোরে আর ধন্না দিতে হয় না, নিজেকে নিজেই ডাকি। তোরাও আমাকে নাম ধরে' ডাক্‌, কাজ হবে।

সবাই ওকে ভেংচাত, নাকী সুরে বল্‌ত—দীনবন্ধু রে আমার!—নানান্‌ দিক থেকে, নানান্‌ রকম সুরে।

ও তেম্‌নিই কোদালের মতো দাঁত মেলে বল্‌ত—আমি সাড়া দিই না।

সত্যিই। সাড়া দেয় না সে। হয়ত এই দীনবন্ধুর মতোই দাঁত বের করে' হাসে। আর—

দীনবন্ধুর একটিমাত্র ছেলে,—সমস্ত জীবনের পুঁজি, মারা পড়্‌ল মোটরের চাকার তলায়।

দীনবন্ধু সারাক্ষণ, মরা খেৎলান ছেলেটাকে বুকের মধ্যে সাপ্‌টে রইল, একটু কাঁদ্‌লে পর্য্যন্ত না। অনেকক্ষণ বাদে খালি বল্লে—আমার ছেলে সারা দিন খাবারের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে' ফের আমারই কোলে ফিরে এসেছে। আর ওকে রাস্তায় ভিক্ষা করতে পাঠাব না।

পুত্‌লিকে কাঁদ্‌তে দেখে বল্লে—কাঁদিস্‌ কেন? আরে, এ যে দীনবন্ধুরই ছেলে—

ছেলেকে চিতায় শুইয়ে বুড়ো আমাকে বল্লে—জানিস্, আমি সেই মোটরটাকে চিনে রেখেছি। রাস্তায় জল দেবার সময় ঠিক মতো যদি পাই, তো জল ছিটিয়ে বেটাকে নাকাল করে' ছাড়্ব—

যে গরীব, সে এর চেয়ে আর কী বেশি প্রতিশোধ নেবে? যা বলা উচিত, বল্‌তে পারে না। হয় ত বলা উচিত—আমিও আমার ছেলেরই মতো ঐ মোটরের তলায় বুক পেতে দেব।

তা, প্রতিশোধ তো ও নিলই। পয়সা দিয়ে দড়ি কিনে গলায় বেঁধে।

ঐ পয়সায় যে ওর একবেলা একমুঠি জুট্‌ত, সে কথাটা ও ভুল্‌লে কেমন করে'?

পুত্‌লি বল্লে—তখন কত রাত হবে কে জানে? আমার দর্‌জাটার সাম্‌নে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ও, আর বিড়্ বিড়্ করে কি বক্‌ছিল।

—কি বক্‌ছিল?

—কি, আবার? নিজের নামটাই বোধ হয়।

ভজুলাল বল্লে—আমি ওকে ডাকৃনু পর্য্যন্ত। ঘুরে বেড়াচ্ছিস্ কেন রে দীনা? ও খালি বল্লে—কত রাতেই তো ঘুমুই—

নির্ম্মলা বল্লে—মাঝ রাতে আমার কবাটে টোকা পড়্‌তেই ধড়্‌মড়্ করে' উঠ্‌নু। বল্লাম—কে? খিল্ খিল্ করে' হেসে ও বল্লে—আমি দীনবন্ধু রে, তোর ঘরে শুতে দিবি? দূর্ দূর্, ঝাড়ু মার্ মুখে!—এক হপ্তার ওপর একটা আধ্‌লার মুখ দেখি নি,—ছোঃ! টোকা পেয়ে সমস্ত গা এমন করে' উঠেছিল ভাই,—

ট্রাম চলে, লোহার লাইন্ ছুটো লোহার চাকায় পিষে পিষে,—

'টিকিটের' জন্য হাত পাত্‌লাম।

বন্ধু অবাক হয়ে খানিকক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে রইল,—চিন্‌তে দেরি হচ্ছে।

পরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,—আরে, কাঞ্চন যে! তুমি? এখানে?

—এই, ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে—

—এত ভালো পাশ ক'রে,—এম্ এ পড়্‌তে গেলে না? শেষে এই? এ কি?

বল্লাম—চাক্‌রি জোটে কৈ?

—না, তোমার আবার চাক্‌রি জুট্‌ত না এ ছাড়া? তুমি পড়্‌তে যাও। আমাদের না হয়—, হাতটা ধরে' ফেলে বল্লে—কি হে লাগ্‌বে নাকি টিকিট?

—এই লাইনটা ভারি কড়াকড়ি ভাই,—ক'স্টেক ষ্টপ্ পরেই ইন্‌স্পেক্‌টর্ উঠ্‌বে—

ও বুক-পকেটের ওপর হাতটা চেপে ধরে' বল্লে—উঠুকই না ইন্‌স্পেক্‌টর্, তখন কেনা যাবে। বুঝ্‌লে না,—তুমি হ'লে বন্ধু,—সাতটা পয়সা বেঁচে যায় ভাই।

কিন্তু ইন্‌স্পেক্‌টর উঠ্‌লই।

ওর সমস্ত মুখ সহসা যেন ভয় পেয়ে কালিয়ে এল।—সাতটা পয়সার জন্যই।

তাড়াতাড়ি একটা টিকিট কেটে ওর হাতে দিলাম।

ও বল্লে—পুরোনো টিকিট বুঝি? আমি নম্বরটা আঙুল দিয়ে চেপে রেখেই দেখাব—

বল্লাম—কোনো দরকার নেই।

নিজের জামার পকেট থেকে সাতটা পয়সা চাম্‌ড়ার ব্যাগ্‌টার মধ্যে রাখ্‌লাম।

নেমে যাবার মুখে ও বল্লে—আপিস্ যাবার সময় এম্‌নি তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে ভালোই হবে ভাই। পুরোনো টিকিট্ দিয়েই এম্‌নি করে পার করে দিও। সাতটা করে পয়সা বাঁচ্‌বে,—সে কি যে-সে কথা? আস্‌বার সময় তো সেই মাঠ চষেই আস্‌ব। তবু সাতটা পয়সা;—ইপিকাক্ থার্টি,—এক ড্রাম পাঁচ পয়সায়। ছেলেটার জন্য ওষুধ কেনা যাবে। বুঝ্‌লে না ভাই,—ত্রিশটাকার কেরাণী—

মনে মনে বলি,—তবে ট্রাম কণ্ডাক্টারই রইলাম,—তোমার সাতটা করে' পয়সা বাঁচুক!

একটি মেয়ে উঠ্‌ল—এমন পাৎলা, হাত দিয়ে আলগোছে একটু টেনে তুল্‌লে হয়!

ভাব্‌লাম, মেয়েটি কুৎসিত হোক্।

কুঁজো হয়ে মুখ গুঁজে বই পড়তে লেগেছে,—কোলের ওপর এক গাদা বই। বইয়ের ফাঁক থেকে পয়সা বের ক'রে হাতের মধ্যে রেখে দিয়েছে। অল্প-তোলা ঘোমটার ভেতর দিয়ে স্বচ্ছ অন্ধকারের মতো কালো চুলের আভাস পাচ্ছি।

দীনবন্ধুর কথা মনে পড়ে। দুই হাতের ওপর জট্‌-ও'লা উকুনের ঢিপি মাথাটা মেলে রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকত চুপ করে'। নিশ্বাস নিচ্ছে,—এই যেন ওর পরম সুখ!...

মুখ না তুলেই পয়সাগুলি হাতের ওপর ফেলে দিল। পয়সাগুলি ভিজা,—ঘামে।

ফের জামার পকেট থেকে সাতটা পয়সা চামড়ার ব্যাগে রাখলাম। এ ক'টা থাক্।

আশ্চর্য্য।

ভজুলালকে পুলিশে ধরেছে।

পুতলি বল্লে—গলায় দড়ি জুট্‌ল না রে তোর? আর কিছু না, আস্তাবলে ঢুকে শেষকালে ঘোড়ার গাড়ীর চাকার রবার চুরি করলি?

ভজুলাল বল্লে—আমি কি দীনবন্ধুর মতো বোকা যে, গলায় দড়ি দিতে যাব?

মাজায় একটা দড়িবাঁধা,—পুলিশের হাতে। কিন্তু মুখে লজ্জার কালিমা নেই,—এতটুকুও নয়। বরং চোখ দুটো যেন খুসিতে ফুলে উঠেছে।

পুলিশকে বল্লাম—মিছিমিছি কেন হাঙ্গাম করছ বাপু?—কত চাও?

ভজুলাল বাধা দিয়ে বল্লে—তুই খেপেছিস্ কণ্ডাক্‌টার? নিক্ না ধরে'। বেশ মাগ্‌না খেতে পাওয়া যাবে জেলে।

—কেন, এখেনেও তো খাওয়া যেত গতর খাটিয়ে। এত বড় দেহটা—

দুটো কাঁধ ধরে' ঝাঁকি দিলাম।

ও বল্লে—ঘুন্ ধরেছে দেহে। দেখ্‌লি তো দীনবন্ধুকে।

—ছাড়া পেলে ফের কি করবি?

পোকে-কাটা দাঁত বের করে' বল্লে—তখন দেখা যাবে। তখন হয় ত ধরা পড়্‌ব না।

সত্যিই ত,'—ছট্টুলালের কি দোষ? ও বল্লে—আমি সেই কখন্ থেকেই ঘণ্টি দিচ্ছি—

দোষ ছাগলটারই—ঘুমোবার আর জায়গা পায় নি? একেবারে লোহার লাইনে মাথা রেখে! পাঁঠা তো নয়, বাদশাজাদা।

ট্র্যামটা দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। অকারণেই। এ তো দীনবন্ধুর ছেলেও নয়।

একটি বাবু বল্লে—চালাও না। বেলা হয়ে যাবে আপিসের।

আরেক জন বল্লে—ভারী তো—

বইর পাঁজা নিয়ে মেয়েটি নেমে গেছে। হয় ত ওরও কলেজের দেরী হয়ে যাচ্ছিল।

নাও হতে পারে। হয় ত এই করুণ দৃশ্য ও ওর ঐ দুটি করুণ চোখ্ মেলে দেখ্‌তে পারে না। ওর চোখের জল বুঝি টল্‌টল্ ক'রে উঠেছে। তাই।

ঝুপ ঝুপিয়ে এক দমক বৃষ্টি হয়ে গেল। যেন যেতে যেতে পথের মাঝে মেঘ তার ব্যথার ঘড়াটা উপুড় উজার করে' ঢেলে দিলে।

কলাপাতা করে' বাঁধা মাছ হাতে নিয়ে পুতলি এসে বল্লে—মাছ-পাতড়ি করছু তোর জন্যে।...কি রে রাঁধিস্ নি আজ?

বল্লাম—গায়ে কাপড় টেনে দে পুত্‌লি, জর হবে।

—নে, কি খাবি আজ?

—উপোস করব।

কেন ?

এ কথার কি উত্তর দেওয়া যায় ? বলা যেতে পারে,—ক্ষিদে নেই, পেট্‌টা ভার।—দাদাবাবু কেন উপোস করেছিল ?—

গায়ে চার্‌খানার চাদরটা জড়িয়ে নিলাম। পুত্‌লি বল্লে—কোথা চল্‌লি ? খেয়ে যা।

ঘাসের ওপর কে যেন বসে' বসে' কেঁদে গেছে ; ভিজা। আমাদের ন্যাড়া বেলগাছটা বাউলের মতো ওর কাহিল কাতর ডালগুলি উঁচিয়ে রয়েছে। যেন গান গাইছে,—তাইরে নাইরে নাইরে না।

তাই। নাই নাই—সে নাই।

মনে হয়, আকাশ তার ললাটে নীলের স্বচ্ছ স্বল্প একটুখানি অবগুণ্ঠন তুলে ধরে' কত রহস্যময়! গৈরিক বৈরাগী পৃথিবী শ্যামলিমার স্নেহাঞ্চলখানি দেহের ওপর গুটিয়ে টেনে কত মহিমাপরিপূর্ণ! জ্যোতির অবগুণ্ঠন টেনে রাত্রির নক্ষত্র আর মধ্যাহ্নের মার্ত্তণ্ড কত দূর, ধরা-ছোঁয়ার কত বাইরে, কী অনির্ব্বচনীয়! জমিদার বাড়ীর আলিশান্ গম্বুজটার কিনারে শুক্ল প্রতিপদের তন্বী পাণ্ডু ইন্দুলেখার অবগুণ্ঠনের তলায় কী সুদূর বিপুল ইসারা!

—প্যাট্‌রা খুলছিস্ যে ? পুত্‌লি বল্লে।

—বাজারে যাব।

—এই রাতে কেন রে ?

আকাশে একটি তারার মণিকা ফুটে উঠেছে। রাস্তায় রাস্তায় ঢুঁড়্‌তে ভালো লাগে,—রাস্তারও একটা সুগোপন রহস্য আছে যেন। ও-ও কথা কয় না, বুক পেতে পড়ে চেয়ে থাকে।

উৎসুক কণ্ঠে পুতলি বল্লে—বগলের তলায় কী ওই পুঁটলিটা ? কি আন্‌লি ?

—তোরই জন্য।

পুতলি তাড়াতাড়ি খুলে ফেল্লে মোড়কটা। একেবারে অবাক, স্তম্ভিত হয়ে গেছে! সেমিজ, শাড়ী, জ্যাকেট,—পুতলি বিস্ময়ে চক্ষু ডাগর ক'রে চেয়ে বল্লে—আমার ?

—হ্যাঁ, তোর। পর্ এগুলো।

—কেন দিলি ভাই এ সব ?

যদি বলি, এগুলো তোর নতুন জন্মদিনের উপহার, ও তার অর্থ বুঝবে না। বল্লাম—অম্‌নি। তোর ভালো কাপড় নেই একটাও। গায়ে জামা না থাক্‌লে কখন ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে—

চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু ওকে। আবরণের বিচিত্র-বর্ণ ওকে অবর্ণনীয় করেছে।

বল্লাম—মাথায় একটুখানি ঘোম্‌টা টেনে দে। কপালটা একটুখানি শুধু ছোঁবে।

সত্যিই। অবগুণ্ঠনের নীচে ওর দুটি কালো চোখ সত্যিই অপার রহস্যে ভরে উঠেছে। ও হাস্‌ল,—ঐ হাসির স্থূল ব্যাখ্যা যেন কিছু নেই। ঐ দূর তারকার হাসির মানে যা, যেন তাই।

ও বল্লে—এবার গাবের আঠায় কালো করা গন্ধ-ওলা জালটা কাঁধে নিয়ে ডোবায় যাই, বাজারে যাই মাছ বেচ্‌তে ?

বল্লাম—আজ তো আর রাঁধি নি। কি দিয়ে খাব তোর মাছ-পাতড়ি ? শুধু শুধু ?

পুত্‌লি খুসি হয়ে বল্লে—খাবি ? কেন, আমার ভাত তোকে বেড়ে দিচ্ছি। আমি না হয় পরে দুটো ফুটিয়ে নেব।

পিতলের থালায় ও পরিপাটি করে' ভাত গুছিয়ে জায়গাটা নিকিয়ে আসন পাত্‌লে। ওর হাতে গড়ানো জল, ও থালের ধারে নুনের ছোট স্তূপটি পর্য্যন্ত মিষ্টি লাগ্‌ছে আজ। বল্লে—খা। লজ্জা করিস্ নে, পেট ভরেই খা। দেব আরো এনে মাছ-পাতড়ি ?

ওর এই সেবা পেয়ে ক্ষুধা যেন বেড়ে গেছে বল্লাম—দে। কিন্তু তোর জন্য যে আর রইল না।

সবটা আমার পাতে ঢেলে দিয়ে আনন্দে যেন বল্লে—না থাক্। তুই-ই খা। আমিই না হয় ইপোস কর্‌লাম।

খাওয়া হয়ে গেলে ঘটি করে' জল ভরে' দিলে আঁচাবার জন্য। বিছানাটা টান্ ক'রে পাত্‌লে, বালিশের কোণের ছারপোকাগুলো দুটি আঙুল দিয়ে ধরে' মেঝেয় ফেলে পায়ের আঙুল দিয়ে টিপে টিপে মার্‌লে।

বল্লে—শো। ঘুমো। এই জান্‌লাটা বন্ধ করে' দি, ঠাণ্ডা লাগ্‌বে।

শুলাম। ও ওর ছেঁড়া মশারিটা তুলে এনে আমার বিছানার ওপর কোনরকমে খাটিয়ে দিলে। ছেঁড়া জায়গাটার ওপর একটা কাপড় মেলে দিলে। পাখা করে' করে' মশা তাড়িয়ে মশারি ফেলে ধারগুলো বিছানার চারপাশে গুঁজে দিলে পর্য্যন্ত।

আবার বল্লে—চুপ্‌টি করে' ঘুমো।

চলে গেল।

একটি কথা কইলাম না। একটি আঙুল ছুঁলুম না। বাইরে রেখে, ওকে কত সাম্‌নে মনে হচ্ছে। ওর দেহের এই বিস্তীর্ণ অবগুণ্ঠনের অন্তরালে যেন বিদেশিনী বিদেহিনী প্রিয়াকে আবিষ্কার করছি।

মশারিটা তুলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম। পুত্‌লি সেই সব জামা কাপড় সুদ্ধুই পাটির ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে আছে,—না খেয়েই!

বাইরে এসে পড়েছি, সন্ন্যাসী বেলগাছটার তলায়। একাকিনী তারার মণিকাটি এখনো জ্বলছে, ডোবে নি। খালি বল্‌তে ইচ্ছে করছে ওকে—তুমি দূর বটে, কিন্তু পর নও।

একাকিনী নয়।

পিতলের হাতলটা জোরে চেপে ধরে' সমস্ত শরীরটায় একটা ঘূর্ণি দিয়ে চলন্ত ট্রাম্‌টায় কে উঠ্‌ল,—বাঙালী সাহেব। চোখে 'পাঁস্‌নে'।

মাটির বাতির স্তিমিত শিখার মতো ম্লানাভ কার' আর একটি দেহেও সহসা তরঙ্গ জেগে উঠ্‌ল যেন,—হিল্লোল। একটা ঠাসা তুব্‌ড়ি যেন ফেটে গেল, বা একটা ডাসা ডালিম।

—তুমি অরুণ, আরে! কলম্বো থেকে ডিরেক্ট, না ম্যাড্রাস হয়ে?

মেয়েটি লেলিহান দীপশিখার মতো ওর দেহ দীর্ঘায়ত করে' দাঁড়িয়ে পড়্‌ল।

—তুমি মুক্তা, সারপ্রাইজ! চমৎকার!

আমাকে ঘণ্টা দিতে ইসারা করে। গাড়ীটা দাঁড়ায়।

ওরা হাত ধরাধরি করে' নেমে যায় তারপর। তক্ষুনি ট্যাক্সি ডেকে লাফিয়ে ওঠে। দেখি। আবার ঘণ্টা দিই—ছুটো। ট্র্যাম্ চলে।

পথিক মেঘ আসে,—অভিসারিক। সন্ধ্যাতারাকে শুধু আড়াল করে' রাখে না, ডুবিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

অবগুণ্ঠনেরই নীচে।

পুত্‌লি ওর জামার গলাটা দেখিয়ে বল্লে—ছিঁড়ে যাচ্ছে।

বল্লাম—ছিঁড়ুক। টেনে টেনে ছিঁড়ে ফ্যাল্। কাপড়টাও। আর কেন?

—আমাকে আর একটা কিনে দিতে হবে কিন্তু, গোলাপী দেখে—

—দোকানিরা সব আমার সুমুন্দি কি না—

দান যেমন অযাচিত, প্রত্যাখ্যানও। ও খালি বল্‌তে পার্‌ল—বোঁচ্‌কা বাঁধ্‌ছিস্ যে?

চল্লাম কাঁধে ফেলে।

—এই রাতে? কোথায়?

—তা কে জানে?

ও আমার হাত ধরে' বল্লে—পাগ্‌লামো করিস্‌নে। থাম্।

হাত ছাড়িয়ে নিলাম ওকে আঘাত দিয়েই। ফের বল্লে—কেন যাচ্ছিস্?

—ছোঃ! এই ঘিন্‌ঘিনে মশারির তলায় কারু ঘুম হয়,—এই এঁদো খোলার ঘরে? পিতলের থালায় খেয়ে খেয়ে আমার পিলে হয়েছে। তারপর ঢেপ্‌সি ঘুটঘুটি কালো একটা মেয়েমানুষ, সারা দিন রাত কানের কাছে ব্যাঙের মতো ঘ্যাঙর্ ঘ্যাঙ্ করছে,—জামার জন্য বায়না,—কোনদিন বা জুতার জন্যই হবে,—কে আর তিষ্ঠোয় হেতা?

—কিন্তু চাকুরি?

—তোর ভাতারের জন্ম খালি রেখে যাচ্ছি,—দেখা হ'লে বলিস্। নে, ছাড়্ দরজা।

দরজা ছেড়ে দেয়।

পেছন থেকে একবার শুধু বলে—একটা কথা শুনে যা,—মাথা খাস্, পায়ে পড়ি তোর—

কে কথা শোনে? বোঁচ্‌কাটা পিঠের ওপর ভালো করে' ফেলি খালি! পথ চলি।

অন্ধকার যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছে—

মোটর সুরথ্ সিং-এর। চালাই আমি।

অবগুণ্ঠন শুধু উন্মোচন নয়, ছিন্ন করব,—টুক্‌রো টুক্‌রো করে'। মনে এই সাধ জাগে। যেমন দীনবন্ধু অবগুণ্ঠন ছিন্ন করেছিল,—

মোটর ত' নয়, বাদ্যযন্ত্র একটা। নিজে ত' বাজেই, আমাকেও বাজায়। বা, ও যেন ময়দানবের বুড়ো বয়সের ছোট্ট ছেলে, দামাল।

ইচ্ছে করে কোনো দুর্দ্দান্ত বিপক্ষের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এই বাদ্য যন্ত্র চুর্‌মার হয়ে যাক্, সঙ্গে সঙ্গে ওর কাপালিক কালোয়াৎ-ও। কিন্তু কেউই সাম্‌নে আসে না, আমিও এগোই না হয় ত। খালি পাশ কাটিয়ে চলা,—খালি ঔদাসীন্য!

বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বল্লে—চাকুরিটা কেন ছাড়্‌লে ভাই?

বল্লাম—আস্তে চলে বলে',—থেমে থেমে।

—কি করবে এখন?

—রেল্ ইষ্টিশানে গিয়ে বস্তায় নীচে পিঠ দেব।

ও ঝাপ্‌সা চোখ ছোট করে' বল্লে—ঝগ্‌ড়া করে' ছাড়্‌লে বুঝি? যেমন আমারটা গেল।

—গেছে?

ঘাড় কাৎ করে' আস্তে বল্লে—গেছে। ছেলেটা মরন্ত, তবু ছুটি দেবে না, দু' ঘণ্টাও না। ছেলেটার দাম যেন তিরিশ টাকারও কম।

পরে থেমে ঢোক্ গিলে বল্লে—হয় ত তাই। ছেলেটাও গেছে।

শুধু অন্ধকার নয়, দিনের রৌদ্রও কাঁদে,—তেম্‌নি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

পরের দিনও দেখা হোল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে নয়, সঙ্গে মোটর ছিল সেদিন।

—এই করছ বল,—তা বেশ।

—চড়্‌বে?

চড়্‌ল। বল্লে—এ চড়ায় আর কি? শুধু শুধু—'

—তোমার কাজ ত' কিছু নেই। মন্দ কি, হাওয়া খেয়ে নাও একটু! হাওয়াও ত' পেট ভরে' খেতে পায় না সবাই।

হেলান্ দিয়ে পা ছড়িয়ে বস্‌তে যেন ওর সঙ্কোচ হচ্ছে। এক কোণে একটুখানি জায়গা নিয়ে ও বল্লে—আপিস্ থাক্‌লে না হয় বল্‌তাম পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে। সাতটা পয়সা বাঁচ্‌ত।

পরে ব্যর্থ পরিহাসের চেষ্টায় ফিকা লজ্জিত হাসি হেসে বল্লে—ছেলে আবার হবে, কিন্তু চাকুরি কবে হবে তা যমও জানে না।

পাটের কার্‌খানায় আগুন লাগে, খোলার বস্তিতে লাগে বসন্ত। সাবাড়, উজাড় হয়ে যায়। ভাঙা থুথ্‌রো বাড়ী হঠাৎ একদিন বেচারী পথচারীদের ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে। পাগ্‌লা ঘোড়া গাড়ী উল্টে দেয়। ছাতের ওপর গায়ে কেরোসিন লাগিয়ে অ-বোলা বৌ ছট্‌ফট্ করে' চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মরে। রাস্তার ওপরে গরু জবাই হয়, আর দেবীর দুয়ারে পাঁটা! কসাইর ছুরি চক্ চক্ করে।

একটা অনন্ত দীর্ঘশ্বাসের মতো মোটর চলে,—একটা অফুরন্ত হাউই।

বেটি আর একটু হ'লেই মোটরের তলায় পড়ে গেছ্‌ল আর কি;—'ক্লাচ্' টিপে ধরি। রাস্তা যেন বেটির ফুল-বাগিচা;—হাঁটি হাঁটি পা পা করে' রাস্তা পার হচ্ছে!

ধমক্ দিয়ে উঠ্‌লাম। ও তক্ষুনিই অভ্যেস মতো হাত মেলে ভিক্ষা চেয়ে বস্‌ল।

খানিকক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে থেকে উঁচু মাড়িগুলি খুলে বল্লে—তুই যে রে—

বল্লাম—তুই আজকাল ভিক্ষে কর্‌ছিস্ নাকি? তোর চোখের পাতায় কিসের ঘা ও? একি, গলায়, হাতে, বুকে,—সবখানে? কী এ সব?

—তাইতেই ত' ভিক্ষা কর্‌ছি। এ ঘা নিয়ে ত' আর রাস্তায় বেরুনো যায় না,—ঢাকাও যায় না কিছুতে।

—হাসপাতালে যাস্ নি কেন?

—নিলে না। ভর্‌তি।

—চল্ দেখি ত' আমার সঙ্গে, কেমন নেয় না।

দরজা খুলে' দিলাম। বন্ধুকে বল্লাম—তবু ওর নাম ছিল নির্ম্মলা।

বন্ধু বল্লে—এখনো আছে।

ওকে বল্লে—বোস। আমার পাশেই।

বল্লাম—পুত্‌লি কি কর্‌ছে রে নির্ম্মলা?

মোটর চল্‌তে থাকে।

—সেবারে বসন্ত হয়েছিল, বাঁ চোখ্‌টা কাণা হয়ে গেছে।

—আর? মুখটা পাঁচিয়ে যায় নি?

—গলি-বদল কর্‌বার সময় কাঁদি ওর ফাল্‌তু বেটপ্‌কা ছেলেটা ওকে দিয়ে গেছে। সেটা পাল্‌ছে।

—আর কিছু নয়?

—আর আবার কি? বাজারে তেম্‌নি মাছ বেচে,—চালের আড়তে ধান ঝাড়ে।

ভজুলাল ফিরেছে জেল থেকে?

—হ্যাঁ, সে ত' কবে। আবার যে জেলে গেছে জানিস না বুঝি।

—এবার কি চুরি করেছিল?

নির্ম্মলা তেম্‌নি মাড়ি বের করে' বল্লে—মেয়েমানুষ।

অগোচরে গ্রহে গ্রহে সঙ্ঘর্ষ লাগে, ধুমকেতু তার পুচ্ছ ছোঁয়ায়! বাসুকি ঠাট্টা করে' গা-মোড়া দিলে লজ্জিতা মাটি হায়রান্ হয়ে ওঠে। শাদা মানুষ আর কাল মানুষ পরস্পরের টুঁটি আঁকড়ে কাম্‌ড়া-কামড়ি করে, শেষকালে দুজনের লাল রক্তে রক্তে কোলাকুলি হয়। রাজা সমস্ত দেশে আগুন লাগিয়ে হাততালি দিয়ে নাচে, মা সহরের গলিতে আঁচলের তলায় নিয়ে মেয়ে ফিরি করে' বেড়ায়। সাহারা হাহাকার করে,—মোড়লের সবুজ ক্ষেতের ওপর দিয়ে গর্জ্জমানা ভৈরবী নদী তার গাত্রবাস উড়িয়ে নিয়ে চলে' গিয়েছিল। তারপর—

সুরথ্ সিং পাশে বসে' বল্লে—এবার ডিপোয়।

তাই যাচ্ছিলাম। কে একটা লোক এসে বল্লে—হাওড়ায় যেতে হবে। সাম্‌নেই সোয়ারী,—দু'পা।

—এই কিরায়াটা নিই। শেষে।

আরো দুটো ট্যাক্সি এসে জমেছে। তাতে যত মালপত্র বিছানা বাক্স। আমারটাতেই ওরা উঠ্‌ল।

দুয়ারের পাশে পুরনারীরা শঙ্খ বাজাচ্ছে,—ওদের কপালে চন্দন লেপে দিচ্ছে, আশীর্ব্বাদ কর্‌ছে। আঁচলের গেরোটা ভালো করে' এঁটে বেঁধে দিচ্ছে। একটি মেয়ে বল্‌ছে—রাস্তায় খুলে ফেল্‌বে জানি—শুধু কাপড়ের গেরোটা। মনেরটা—

মোটরের চীৎকারে বাকিটা শোনা যায় না। মেয়েটির কণ্ঠস্বর কেন জানি কানে ভারি করুণ লাগে।

মুক্তার কলরব মোটরের আর্ত্তনাদকে লজ্জা দিচ্ছে। মোটরটা থামিয়ে কান পেতে শুন্‌তে ইচ্ছা করে।

মুক্তা খালি বল্‌ছে—ছুটি ছুটি, আকাশে আজ ছুটির ঘণ্টা বাজ্‌ল।

অরুণ বল্‌ছে—পাশে তুমি, পকেটে টাকা;—গোঁফটা নেই, থাক্‌লে তা দিতাম।

অরুণ যেন সৌখীন দখিন্ হাওয়া, আর মুক্তা যেন চাঁপার পেয়ালা।

ইষ্টিশানে পৌঁছে সুরথ্ সিংকে বল্লাম—বোস একটু। এই আস্‌ছি,—এলুম বলে'।

মোটরটা থেকে লাফিয়ে পড়্‌লাম।

সুরথ সিং সেদিন মোটরটা নিয়ে একলাই ডিপোয়

ফিরেছে। আমার জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করেছিল, কে জানে?

ট্রেন চলে।

ভীষণ ভিড়। দরজার ধারে থালি দাঁড়াতে পাই একটু। মুখ বাড়িয়ে চেয়ে থাকি বাইরে,—অন্ধকার দেখি। দূরে চাষার ছনের ঘরে মাটির বাতি জলে,—বাঁশের বনে ঝিঝি ডাকে, জোনাকিরা হলুদে পল্‌কা পাখা মেলে নেচে নেচে নিবে যায়।

কোথায় চলেছি জানি না। সারা দিনের রোজগার সুরথ্‌ সিং-এর পাওনা অনেকগুলি টাকা পকেটে আছে! যতদূর নিয়ে যেতে পারে—

একটা ইষ্টিশানে সেই চাকরটার সঙ্গে ভাব কর্‌লাম। ওর নাম, সুন্দর। বল্লাম—কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

—সে অনেক দূরে। পাঞ্জাবে। তুমি কোথায়?

—সেইখানেই।

এবার খোঁজ নিলাম। ওরা যেথানে যাবে ততদূর আমার টাকা টান্‌বে না। তার সাতাশ মাইল এদিকে নেমে হাঁ করে' বাতাস খেতে হবে। যাক গে, তাই সই।

নখ্‌ দিয়ে মাটি আঁচড়ালে নখ্‌ ভিজে ওঠে না,—বাংলার মাটির মতো সান্ত্বনায় ভিজা, নরম নয়,—রুক্ষ, তামাটে। গায়ে সবুজ নয়, গেরুয়া।

সুদূর প্রসারিত মাঠের মধ্যে একা চুপ করে' বসে আছি, দূরে রেল-ইষ্টিশানের ভাঙাচোরা কোলাহল আকাশের তন্দ্রালুতায় ব্যাঘাত করছে। ওরা আমাকে সাতাশ মাইল পেছনে ফেলে গেল।

পকেটে কাণাকড়িও নেই। দাদাবাবু আর চিঠি লেখে নি,—বহুদিন। কোথায় ভেসে গেছে—কিছুই জানি না।

দাঁড়াই। তারপর পা ফেলে ফেলে চলি, রেল-লাইন ধরে'। সাম্‌নে খাল পড়লে সাঁত্‌রে পার হয়ে যাই।

মুহূর্ত্তের শোভাযাত্রা চলেছে, ঋতুর মিছিল, তৃণের অভিযান, তারার নৃত্য, প্রাণবুদ্‌বুদের স্রোত। আমি চল্‌তে চাই, জিরোতে চাই না, আমার বুকে অগাধের সাধ জেগেছে,—অবাধ। পা যখনই হুম্‌ড়ে পড়্‌তে চায়, তখন দৌড়ে চল্‌তে চেষ্টা করি। পরিশ্রান্ত হয়ে যেতে ইচ্ছা করে।

কা'র সন্ধানে চলেছি? নীল পাখীর, নীল ফুলের, নীল আকাশের।

পৌছুনো গেল। কিন্তু পয়সা নেই। জীবনে সব চেয়ে প্রকাণ্ড 'নেই'। কিম্বা হয় ত সব চেয়ে প্রকাণ্ড 'থাকা'—এই অসীম ক্ষুধা, এই রিক্ত নগ্ন উদার দারিদ্র্য,—অসহায় নিদারুণ মৃত্যু।

সত্যি সত্যিই বস্তা বইব। এক বাবুকে বল্লাম—কেন মিছিমিছি টাঙা করছেন? মাইল দুয়েকের মধ্যে বাড়ী হয় ত' বলুন, কাঁধে করে' নিয়ে যাই। সঙ্গে ত জেনানা নেই,—এটুকু হাঁট্‌তে আপনার কষ্ট হওয়া উচিত নয়।

ভদ্রলোক মুখের দিকে চেয়ে খুসি হয়ে বল্লেন—বেশ ত,'—পার্‌বে বইতে এত সব?

—বহুৎ খুব।... দিন্‌ এটা কাঁধের ওপর দিয়ে গলিয়ে। ব্যস্‌। চলুন—

ঘাম মুছে রাস্তায় বেরোতেই সুন্দরের সঙ্গে দেখা।

—বাকি পথটা পাওদলেই এলাম। কিন্তু ভাই একটাও আধ্‌লা নেই। মোট্‌ বয়ে মোটে এই দুটো আনি পাওয়া গেল,—ঢের। একটা কোথাও কাজ-টাজের সুবিধে হতে পারে, জান?

—আরে! আমি যে লোকের খোঁজেই বেরিয়েছি: মাঠ সাফ্‌ করতে পার্‌বে—গাছ গাছাড়ি কেটে? বাবুরা টেনিস খেল্‌বেন।

—নিশ্চয় পার্‌ব। পুকুর কাট্‌তে বল, গাছ ফাড়তে বল,—সব।

—লঙ্কা ডিঙোতে?

—তাও।

সন্ধ্যাসন্ধিতে টেনিস কোর্ট তৈরী হয়ে গেল। অরুণই সব তদারক কর্‌লে! মুক্তার সারা দেহে ফুর্ত্তি যেন আর

ধরে না, সাগরের মতো অতল, ডাগর চোখের কোণ্ বেয়ে উপ্‌চে উপ্‌চে পড়ে। নতুন দেশের আব্‌হাওয়ায় ওর গালে এত সকালেই লাল ফুটেছে।

ও যেন একটি গীতিকবিতা, ভাটার টানের ভাটিয়াল সুর। ও যেন মধ্যদিনের অলস তপ্ত শ্রান্তিকর দু'পহরে ভ্রমরের চপল অস্ফুট গুন্‌গুনানি।

আমি আর সুন্দর দু'দিক থেকে বল্ কুড়োই। মুক্তা পারে না, আর হাসে। বলে—তুমি খালি খালি প্রত্যেকবার জিতবে,—এ হবে না।

'নোভিস্' ওর সঙ্গে খেলে আমিও জিততে পারি।

অরুণ ইচ্ছে করে' এ-দিকে ও-দিকে ভুল করে' মারে তারপর। একটা বল্ আচম্‌কা মুক্তার কপালের ওপর লাগ্‌ল। মুক্তা কপালে হাত চেপে উহু করে, আর খিল্ খিল্ করে হাসে—লুটিয়ে লুটিয়ে। তারপর হাঁপায়।

খেলা সাঙ্গ হয়। সুন্দর পর্দ্দা আর নেট গুছোয়। ওরা পাশাপাশি র‍্যাকেট দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়ায় মাঠে মাঠে। আমি ফিরে যাই,—ইষ্টিশানের কাছে কুলির বস্তিতে।

মুহূর্ত্তের ঠেলায় কতদূরে এসে ঠেকেছি। ইচ্ছে হোল, ফিরে যাব। পিঠে নয়, বুক দিয়ে কাকে যেন বইতে চাই। নীল আকাশ খালি পঞ্চনদীর তীরেই নয়, যেখানে দাঁড়াই, সেখানেই, মাথার ওপর। আঠা দিয়ে অসীমের অবগুণ্ঠন চারদিক থেকে আটকানো। তাকে তোলা যায় না,—খোলা যায় না,—

এ কা'র বেগার খাটছি? ঘাড়ে ব্যথা ধরেছে; চাইছি আহ্লাদির সেই বালিশটা, কোন্ মা'র সুকোমল একখানি কোল।

ভোঁতা ভুটিয়া কুলি-মেয়েটা বে-আক্কেল,—ওর মধ্যে একটুও ভাণ নেই। তাই ভালো লাগে না।

সুন্দরের সঙ্গে দেখা করে' যাব। সুন্দর ওর টালির ঘরে বসে তামাক টান্‌ছে।

—কি হে, টেনিস কোর্টে যে আবার চোরকাঁটা গজিয়েছে। দেব নাকি সাফ্ ক'রে?

—দরকার নেই। বাবুরা খেলে না আর।

—কেন?

—বাবু আজ দিন দশেক হোল দিল্লী যাবার নাম করে' যে বেরিয়েছেন, আর পাত্তা নেই। গিন্নি-মা যে একলাটি আছেন, সে দিকে হুঁস্ই নেই যেন। খালি একটা খোট্টা ঝি।

আমার হাতে হুঁকোটা চালান্ করে' গলার স্বর নামিয়ে বল্লে তারপর—এমন পরীর মতো বৌ ছেড়ে ফুর্‌ফুরির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না—

—বাবু কি করে রে?

—কোথায় নাকি খনি পেয়েছে আভের, তাইতেই দেদার্ পয়সা। বেবাক্ ঢাল্‌ল বলে'—

—যা তা কি বল্‌ছিস্ সুন্দর? যাক্, আমি কালই চলে যাচ্ছি এখান থেকে।

—কেন? কোথায়?

হেসে বলি—দিল্লীতেই।

ও মুখ ভার করে' বলে—আমারো টিক্‌ছে না মন। বিষম দায়।

—যাই, গিন্নি-মা'র পায়ের ধূলা নিয়ে আসি।

সুন্দর অবাক্ হয়ে মুখের দিকে তাকায়। কিছু বল্‌বার আগেই পা ফেলি ঘরের দিকে—

দূর থেকে মুক্তাকে দেখা যাচ্ছে, হেমন্তের ধূসর উদাস সন্ধ্যার মতো। জান্‌লার কাছে বসে' ফ্যাকাসে আলোয় বই পড়্‌ছে। তাই ওকে বেশি নিঃসঙ্গ, বেশি বিষণ্ণ মনে হচ্ছে। আর কিছু নয়,—দূরে একটা চেয়ারে বস্‌ব শুধু,—তারপর সাহিত্য, দেশ, ধর্ম্ম, রাজনীতি,—এ নিয়ে তর্ক আর আলোচনা। ভিক্টর হিউগো, বায়রণ, ডষ্টয়ভ্‌স্কি থেকে যতদূর খুসি,—এ-ই, ইট্‌স পর্য্যন্ত। প্রতীভার দীপ্তিতে দু'জনের চক্ষু উজ্জ্বল, নূতন নূতন অসাধারণ তথ্য আবিষ্কারে দুজনের বুক উৎফুল্ল। মন কি রকম জোয়ান্ হয়ে ওঠে! বিজ্ঞানের বিদ্রোহ, সঙ্গীতের সুরা,—যা ওর ভালো লাগে।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম। পায়ের শব্দ শুনে সচকিতে সতর্ক প্রশ্ন এল—কে?

—আমি।

যেন কত পরমাত্মীয়! শুধু ঐটুকুতেই সবটুকু পরিচয়।

—কে তুমি? কি চাও এখানে?

সুন্দরকে খুঁজ্‌তে এসেছিলাম।

—তার মানে? সুন্দর কি দোতলায়,—এই বাড়ীতে থাকে নাকি? কে তুমি? যাও বেরিয়ে। এই সুন্দর!

চলে' যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কি ভেবে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে পিছু থেকে ডাকলেন—শোন। তুমি,—আপনি—আপ্‌নি কি অসিতার দাদা? যে আমাদের সঙ্গে পড়্‌ত, কেমন চেনা চেনা লাগ্‌ছে। না না, তুমি আমার সেই ছেলেবেলাকার মণ্টু-দা, নয় কি? হ্যাঁ, তুমি এখানে কি ক'রে এলে, কবে? বোস,—তোমার কথা—

বাধা দিয়ে বলি—না, আমি কেউ নই।

মুক্তার ভুল ভাঙে। চেঁচিয়ে বলে—কে তবে তুমি?

—আমি পিয়াদা, মুসাফির। বাঙালীই বটে। ভাগ্যের সঙ্গে কুস্তি কর্‌তে কর্‌তে এখানে এসে ঠিক্‌রে পড়েছি।

বইটা মুড়ে রেখে বলে—সুন্দরের কাছে কেন এসেছিলে?

—যদি কোথাও একটা কাজ-টাজ জোগাড় করে' দিতে পারে। বিবাগী মানুষ।

—এতদিন কি করতে?

—পিঠ পেতে বস্তা বইতাম, না পেলে টহল করি, আর কি। নিজে ত' উপোসীই, পকেট দুটোও হাঁ করে' আছে। পয়সা না পাই ত' হেঁটেই পাড়ি দেব বাংলা দেশ।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুকটা ফুলিয়ে কথা কই।

মুক্তা ওর মোহে-মাখা দুটি চোখ কমণীয় করে' বলে,—সত্যি যদি তুমি মণ্টু-দা হও ত,' বল। তোমাকে যে আমার ভারি চেনা লাগ্‌ছে। সেই ঘুড়ি ওড়াতে ছাত থেকে পড়ে' গেছ্‌লে তুমি, সেই রাতটা কত কেঁদে-ছিলাম! এতদিন হয়ে গেল, তবু—

—না না কেউ নই আমি। আমি ইষ্টিশানের কুলি একটা।

নেমে যাই সিঁড়ি বেয়ে।

ও জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে—আমাদের শীগ্‌গিরই একটা শাম্পানি আস্‌বে, আর দুটো গরু। তুমি হাঁকাতে পারবে?

—হ্যাঁ।

—খানায় ফেলে দেবে না?

—না।

—তবে থেকে যাও। পায়ে হেঁটে বাংলা দেশে গিয়ে কাজ নেই।

—আচ্ছা, নমস্কার।

হাত জোড় করে' কপালে ঠেকালাম।

ও ওর তর্জ্জনীটি হেলিয়ে বল্লে হেসে—তুমি মণ্ট-দাই। নিশ্চয়।

শাম্পানি এল, দুটো 'বয়েল্‌'-ও এল,—আমিই লাগাম লাগালাম।

ল্যাজ তুলে জাঁদ্‌রেল গরু দুটো বেতোয়াক্কা হয়ে ছোটে,—মুক্তা আবার ওদের গলায় ঘণ্টা বেঁধে দিয়েছে; দেহাতি বালির রাস্তা ধুলায় ধুলায় ধূ ধূ করে।

কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটে, কুয়ো থেকে গেঁয়ো মেয়েরা ঘড়ায় করে' জল তুলে কাঁকালে করে' বয়।

মুক্তার সেই অকারণ ভুলের ভেলা ফেলে দিয়েছে। আমাকে 'বইলম্যান্‌' ব'লেই চিনেছে,—এর বেশী কিছু নয়।

ভোরবেলা শিশির না-শুকাতেই গাড়ী জুত্‌তে বলে,—ওর নিজের চোখের পাতায় তখনো ঘুমের শিশির ঢেলে হয়ত বা অনিদ্রার কুয়াসা। পাইন্‌ বনের ওপর দিয়ে ফিন্‌ফিনে পাত্‌লা মেঘ পায়চারি করে' বেড়ায়।

কোন কথা কয় না। খালি গরুর গলার ঘণ্টা বাজে,—ভোরের উদাস, বিভোর ভৈরবীর মতো। আমার মাঝে কি যেন আবিষ্কার করবার আশায় মাঝে

মাঝে অতল অপলক চোখে খানিক তাকায়। ঘনশ্যাম নিবিড় বনানীর চাহনি।

এক একদিন বলে—তোমার দেশের গল্প বল, পদ্মার।

গল্পটা জোড়াতালি দিয়ে শেষ করি। সে কী বিপুল বন্যা, কী উত্তাল ফেণিল জলস্রোত, ভালবাসার মতো। ক্ষেত-খামার গোলা-আড়ৎ, সব ভেসে গেল; চোখ্ মুখ বুক,—জীবন-মরণ ইহকাল, পরকাল।

ওর চোখ দুটি একটু কাঁপে। বলে—কেন দেশ ছাড়্‌লে ? কোন্ দুঃখে ?

আকাশকে আড়াল করবার জন্য যে দুঃখে মানুষ ঘর বাঁধে, সেই সমান দুঃখেই পথ নিয়েছি!

গাড়ীটা ফেরে। চঞ্চল পাখীর অস্ফুট কূজনের সঙ্গে তাল রেখে মৃদু মৃদু ঘণ্টা বাজে।

মুক্তা আবার প্রশ্ন করে—কে তোমার আছে ?

—দুটো পা, আর পথ,—পৃথিবী। আর হাত ধরে' ধরে' চলেছে আমার সহোদর ভাই,—মৃত্যু।

আবার ভুল করে। কাঁপা, কুণ্ঠিত গলায় বলে—তুমি কে ?

মনে মনে বলি, হয় ত তোমার ছেলেবেলাকার মণ্টু-দা'ই। আমি নিজেকেই হয় ত ভুলে' গেছি, চিন্‌তে পার্‌ছি না।

সন্ধ্যাবেলায় অরুণ হাঁকে—গাড়ী হাঁকাও জল্‌দি। পৌনে আটটার মধ্যে পৌঁছে দিতে পার্‌লে বকশিস্ এক টাকা। বলে' এক টাকা ওয়েষ্ট কোটের পকেট থেকে বের করে ছুঁড়ে দিলে আমার দিকে। টাকাটা গড়িয়ে পড়ে' গেল পথে। কুড়িয়ে নিতে কেয়ার করে না। যেন একটা মুশাফির ভিক্ষুক ঐ টাকাটা পায়,—গরুর গলার ঘণ্টা যেন এই কথাই বল্‌তে বল্‌তে চলে। বলে—ঘরে ফিরে চল্ ভাই—,

সাহেবী ক্লাবের সমুখে গাড়ী দাঁড়ায়। অরুণ নেমে বলে—বারোটার সময় নিয়ে এসো গাড়ী।

বারোটার সময় গাড়ী নিয়ে যাই। কোনো কোনো দিন ভোর বেলায়ই বাবুর বারোটা বাজে।

সুন্দরকে বল্লাম—আজ তোমার পালা ভাই।

সুন্দর গাড়ীর মধ্যে বিছানা পেতে পা ছড়িয়ে বসে গরুর ল্যাজ মলে' দেয়। রুণুঠুনু ঘণ্টা বাজিয়ে ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে গাড়ী চলে ঘুম পাড়িয়ে পাড়িয়ে।

কখন মুক্তার ঘরের আলো নিবে গেল, টের পাই। নিশুতি রাতের স্তিমিত অন্ধকারে খালি একটি মুখ মনে পড়ে,—তার একটা চোখ কাণা, ঐ ক্ষীণ পাংশু চাঁদের টুকরোটার মতো! তার মুখে সংখ্যাতীত বসন্তের দাগ,—যেন নক্ষত্রখচিত কুৎসিত ঐ আকাশটা!

সুন্দরের কাঁধ জড়িয়ে টল্‌তে টল্‌তে অরুণ এল;—রাত আঁধিয়ারা। সুন্দরই ঘর পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল যা হোক্।

এসে বল্লে—ভীষণ গিলেছে আজ। নাও বিছানাটা পাত' শিগগির। বাবা—

বলেই চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ল।

হঠাৎ একটা চীৎকারের চাকু অন্ধকারকে যেন চিরে' গেল। এগোলাম।

দরজাটা দু'ফাঁক। দুরন্ত দস্যুর মতো দখিন হাওয়া ঘরের মধ্যে লুটের লাটু ঘুরিয়ে দিয়েছে। ল্যাম্পটা চৌচির হয়ে মেঝের ওপর ফাটা, কাদাটে চাঁদের আলোয় চিক্‌মিক্ কর্‌ছে।

আবার প্রশ্ন এল—কে ?

দেশলাই জ্বালালাম। খাটের ওপর অরুণ শোয়া,—গোঙাচ্ছে। আমাকে দেখে মুক্তা সোফা থেকে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বল্লে—কি চাও ?

বল্লাম—আপনার ভুরুর ওপর থেকে কেটে গিয়ে যে রক্ত গল্‌ছে, সে জায়গাটা বেঁধে ফেলুন।

ও একটা পাখা নিয়ে অরুণকে হাওয়া করতে করতে বল্লে—তোমার তাতে কি ?

—পাখা পরে করলেও চলবে,—কিন্তু কোথায় আইডিন্ আছে বলুন,—বেঁধে দিই।

ও পাখাটা দিয়ে দরজা দেখিয়ে বল্লে—কে তোমাকে মাথা ঘামাতে বলেছে? যাও এখান থেকে—বলে' ফের পাখা চালাতে লাগ্‌ল। অরুণের চুলে আঙুলও বুলোতে লাগ্‌ল খানিক।

মদ খেলে দাদাবাবুকে দেখাত গরীব, দুঃখী,—যেন বুকের ভেতরটা ফাঁকা, খাঁ খাঁ করছে। আর একে দেখাচ্ছে—বীভৎস, বিকট। কিন্তু, কে জানে? হয় ত ওরও মনের মরুতে মেঘের মমতা মাখা নেই, হয় ত ও-ও একলা, পিয়াসী!

বল্লাম—তাই যদি হয়, তবে শুধু ঐ টুকুন্ পাখা-চালানোয় কি হবে? যে মদ খায়, তাকে আরো ভালোবাসুন, ভাসিয়ে নিয়ে যান। সব চেয়ে ভালোবাসার দরকার তারই যার কান্না শুকিয়ে গেছে—

ও পাখাটা আস্তে আস্তে পাশে থুয়ে সোফাটার ওপর বসে' পড়্‌ল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লে,—যেন বিষাদে ভরা, গোধূলিতে মন্থরচারী গরুর গলার ঘণ্টার মতো উদাস;—যেন বল্‌ছে—ফুরিয়ে গেছে মণ্টু-দা। ওর ঘা-টা তারপর আস্তে আস্তে বেঁধে দিলাম।

বল্লাম—ওখানে মেঝের ওপর বিছানা পেতে দিই। এবার ঘুমোন্।

ও শুধু বল্লে—দাও। পূবের জানালার ধারে,—। নীচেরটাও খুলে দিও।

বিছানা পেতে দিলাম।

বল্লে—ঐ লাল বইটা বালিশের তলায় রাখ, আর এই নীলটা পাশে। আর বাকি গুলো চারপাশে ছড়িয়ে দাও,—এলোমেলো করে'। তুমি—

দরজাটা ভেজিয়ে বেরিয়ে যাই। মাঠের মধ্যে গিয়ে দূর থেকে ম্লান জ্যোৎস্নালোকে দেখি, বিছানা শূন্য;—এখনো শুতে আসে নি। কি করছে মুক্তা? হয় ত অরুণের পাশে বসে' পাখাই চালাচ্ছে সারারাত।

অরুণ পেণ্টালুনের পকেট হাতড়ে একটা চাবি বের করে' মুক্তাকে বল্লে—ক্যাশব্যাক্সের চাবিটা রাখ—ওর মধ্যে প্রায় সাড়ে তিনশ টাকা রইল তোমার এ ক'দিনের খরচের জন্য। এবার অনেকগুলি রূপোর চাক্‌তি হাতড়ানো গেছে। এবার অন্তত একটা খোকা-মোটরকার কিন্‌তেই হবে।

মুক্তা শুধু বল্লে—এবার কি ফিরে আস্‌তে খুব দেরী হবে?

হয় ত হবে একটু। দরকার হলেই আমাকে তার্ করবে,—আমি যেখানেই যাই তোমাকে জানাব। তুমি কল্‌কাতায় বিজনকেও লিখতে পার, সে না হয় ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটে চাক্‌রীর জন্য কপাল কুটে কুটে না হায়রান্ হয়ে এখানে দিন কতক বসে' বসে' গিলে চেহারার ভোল্ ফিরিয়ে নিক্ না। যদি ইচ্ছা হয় ওর সঙ্গে কল্‌কাতায় ফিরে যেতে পার।—যা তোমার খুসি।

বলে' ছুটে নেমে গাড়ীটায় এসে বস্‌ল। গরু ছুটোর ল্যাজ ম'লে দিলাম।

মুক্তা নীল বইটা হাতে নিয়ে একান্ত মনোযোগে পড়ছে। একবার তাকিয়েও দেখ্‌লে না। ও যেন একটা ফুরোনো ফোয়ারা,—উজাড়-করা উদলা একটা ঘট।

যেতে যেতে প্রশ্ন করলাম—কোথায় যাচ্ছেন?

দিল্লী—

উদ্দেশ্য?

ব্যবসা। সেখান থেকে আগ্রায় যাব, তাজ দেখতে। এবার দেখব অমাবস্যায়—

গরুর গলার করুণ ঘণ্টার কাতর কাকুতি শুনে আপন মনেই বলে—অন্ধকারে পাষাণের পুঞ্জিত দীর্ঘশ্বাস শুনব? তারপর রাজপুতনার ওপর দিয়ে ছুটে যাব,—লু-র মতো—

কবে ফিরবেন?

ফির্‌ব? ড্যাম্। হাঁ ফির্‌তে হবে বৈ কি। যখন ডানা বুজে আস্‌বে,—ঘুম পাবে যখন।

মরা, নিশুতি রাত, ঘুমন্ত মনের সঙ্গে আকাশের তারা কানে কানে কথা কয়, স্বপ্নের সুরে। যেন কী অকূল চেনাচিনি, চোখের জলের সঙ্গে চাঁদের, ভালোবাসার সঙ্গে অন্ধকারের!

কথা কইতে না পারার সঙ্গে এই ব্যর্থ বিস্তীর্ণ বিদীর্ণ শূন্যতার।

পা টিপে টিপে শিয়রের কাছের চেয়ারটায় বস্‌লাম।

আবার সেই সুগভীর অতল জিজ্ঞাসা—কে তুমি?

আমি।

মুক্তার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। থেমে বল্লে—তুমি পুরুষ?

চেয়ারের হাতলটা মুঠির মধ্যে সজোরে চেপে ধরে' বল্লাম—হ্যাঁ।

ও! একটা বিশ্বাস ফেলে বল্লে—কুৎসিত, বিচ্ছিরি, ভেজাল।—আর আমি কে জান?

তুমি মুক্তা। তাই ত তোমাকে জানি না।

আচ্ছা, তোমার সঙ্গে মণ্টু দা'র কোনদিন দেখা হবে? তুমি ত পায়ে পায়েই নাকি পাড়ি দেবে এ পৃথিবী। যদি দেখা হয়,—আমার কিছু ভালো করে মনেও নেই। তেরো বছরের আগেকার একটি দশ বছরের দুষ্টু ছেলে,—তার জামার উপর দিয়ে ক্ষুদে কাপরটি বাঁধা, তার লাল পাড়টা আমার কপালের সিঁদুরের মতোই ডগ্‌ডগে—এখনো মনে পড়ে। আর মনে পড়ে সেই আমের শাখায় দোল্‌না, দোলায় দোলায় বউল ঝরে' পড়ত। তাকে ত' ভুলেই ছিলাম, তার ভালো নামও মনে নেই। হঠাৎ—

—যেদিন তোমার ঘোমটা খুলে গেল, সেদিন। যেদিন আকাশের তারা মাটির বাতি হয়ে বাদ্‌লা পোকার পাখা পোড়াতে লাগ্‌ল। দেখা হলে কি বল্‌ব তাকে?

কীই বা বল্‌বে? বলো—

তার চেয়ে তোমার কল্‌কাতার বিজনকে 'তার' করি। সে আসুক, তোমাকে নিয়ে যাক্। তোমার স্বামী এখন কোথায়, জান?

নাইনিতাল।

তাঁকেই তার করি।

—দরকার নেই। একা মরতে আমার কষ্ট হবে না। মরণও ভারি একা,—

অরুণ একদিন একেবারে হুড়মুড় করে এসে পড়ল,—রাজ্যশুদ্ধু যত ডাক্তার কব্‌রেজ হাতুড়ে ওঝা নিয়ে,—এক এলাহি ব্যাপার। এক রাতেই ওর যত বাক্স ছিল, সব হাঁ হয়ে গেল।

মুক্তা নিশ্বাস ফেলে বল্লে—মুক্তি।

সেই হতেই মুক্তার মেয়ের নাম—মুক্তি।

অরুণের সেদিনকার উন্মত্ততা বিধাতার জানা আছে,—যেদিন এ কন্যা পৃথিবী জন্ম নিয়েছিল।

দু' দিন বাদেই আবার তল্পিতল্পা বাঁধলে। আবার অনেকগুলি টাকা জিম্মা রাখলে, চাবি দিলে, আরো একটা ঝি বাহাল কর্‌লে,—একটা নার্স ও। খুব সাবধানে থাকতে বল্লে, বল্লে এবার ইচ্ছা হলে বিজনকে চিঠি লিখো, তোমাকে যেন নিয়ে যায়।

বল্লাম—কোথায় যাচ্ছেন এবার?

—দক্ষিণে। এর পর জলের উপর পাল তুলে দেব ভাব্‌ছি,—লোনা জলের।

সেদিন মুক্তা আমাকে বল্‌ছিল—ওর নাম মুক্তি। ও আমাদের মুক্তি দিলে,—ভালবাসার ভার থেকে।

নার্সই মেয়েটাকে নাড়ে চাড়ে, নাওয়ায় খাওয়ায়, ঝাড়ে পোঁছে। ও ওর সেই নীল বইটা কোলের ওপর মেলে চুপ করে' চেয়ে থাকে। আর কথার অতীত সুর শোনে। মেয়েটাকে ছুঁতেও যেন ওর ঘেন্না হয়,—এম্‌নি।

ভালোবাসার মতো রাত নেমে এসেছে,—ভালোবাসার মতোই বৃষ্টি।

হাওয়ায় যেন কে শুধোল—তুমি জেগে আছ?

—হাঁ, আছি বৈ কি।

অবাক্ হয়ে তাকালাম,—সাম্‌নে মুক্তা। বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছে,—চোখের পাতায়, ঠোঁটে, ললাটে বৃষ্টি-বিন্দু, গলার স্বরও যেন বৃষ্টিতে ভিজা।

বল্লে—গাড়ীটা ঠিক কর।

—কোথায় যাবে? এত রাতে, বৃষ্টিতে?

—যেখানে তোমার খুসি, নিয়ে চল।

ওকে ভারি একা, শীর্ণ, পাণ্ডুর দেখাচ্ছে। বল্লাম—খুকী?

—ও তো মুক্তি—

গাড়ীটায় চাপ্‌ল। বল্লাম—তোমার্ গায়ে যে জড়াবার একটা চাদরও নেই।

—কোন দরকার নেই। তুমি যে বাইরে বসে' বসে' খালি ভিজ্‌বে।

—তাতে কি? চারদিকের ঝাঁপগুলো বন্ধ করে' দিই।

দিলাম।

সমানতালে বৃষ্টি চলেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে গরুর গলার ঘণ্টা,—করুণ কান্নায় ভরা।

চরাচরব্যাপী অন্ধকার,—এও ভালোবাসারই মতো!

সাম্‌নে একটা নীচুঁ মাঠ, জলে থৈ থৈ করছে। বল্লাম—সাম্‌নে যে জল—

ও ভারী গলায় বল্লে—জলের ওপর দিয়েই চল।

বৃষ্টিতে স্নান করছি,—ভালবাসায়ই। জলের নূপুর বেজে চলেছে—

ও বল্লে—গাড়ীটা থাম্‌ল যে?

—গরু চল্‌তে চাইছে না। আর কতদূর যাবে? এবার ফের।

—ফির্‌তে হ'লে তুমি ফের। লাগামটা আমার হাতে দাও।

নিজের গায়ের কম্বলটা চিপে কাজ্‌লার ওপর চাপিয়ে দিলাম খানিক বাদে আবার শ্যাম্‌লার ওপর চাপাই।

অবোলা গরু দুটো নিজের গলার ঘণ্টা শুন্‌তে শুন্‌তে চলে,—জিরিয়ে জিরিয়ে।

মাঠ পেরিয়ে আবার পথ পেয়েছি। কিন্তু অচেনা। কোথায় চলেছি, কেউ জানি না।

আবার বলি হয় ত খুকী জেগে উঠে তোমার জন্য কাঁদ্‌ছে। এবার গাড়ীটা ফেরাই।

ও কিছু বলে না। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

বৃষ্টির বিরাম নেই,—একটু ধরে' আবার দমকে দমকে আসে,—সমস্ত আকাশ যেন ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছে।

গাড়ীও চলে,—এব্‌ড়ো পথ,—থেমে থেমে, ঘুমিয়ে। ঘন অন্ধকার, মাঠ বাট সব মুছে গেছে—

বলি—আর আমাকে কতদূর নিয়ে যাবে?

কোন জবাব নেই,—চারদিকের ঝাঁপ বন্ধ। খুল্‌তে হাত ওঠে না। লাগামটা ছেড়ে দিয়ে হাঁটুর ওপর মুখ গুঁজে পড়ে' থাকি,—বৃষ্টির ঝাপ্‌টায় সমস্ত শরীর ক্লান্ত, অবশ হয়ে এসেছে।

হঠাৎ একটা উঁচু পাথরের ঢিবির সঙ্গে গাড়ীর চাকার ধাক্কা লেগে গাড়ীটা কাৎ হয়ে পড়্‌ল। চম্‌কে লাফিয়ে পড়ে' চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম—মুক্তা!

ঝাঁপ খুলে' দিলাম।—মুক্তা গাড়ীর মধ্যে নেই।

সাম্‌নে পেছনে চারপাশে ঘুটঘুটি অন্ধকার, আঠার মতো। গলা টিপে ধরছে। গরু দুটো মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে' শীতে কাঁপ্‌ছে। চেঁচিয়ে, অন্ধকার টুক্‌রো টুক্‌রো করে' চিরে' ফেলে ডাক্‌তে ইচ্ছে করছে—মুক্তা,—মুক্তি! কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না।

হয় ত ও গাড়ী থেকে কখন নেমে বাড়ীই ফিরে গেছে। হয় ত ও ওর মেয়েরই ডাক শুনেছে,—এই চপল বৃষ্টির উছল কলতান শুনে,—গরুর গলার উদাস ঘণ্টারব শুনে—'

অজগর-মণি

[একদৃশ্যের একাঙ্ক নাটক।]

শ্রীমন্মথ রায়

[* দৃশ্যঃ—

অজন্তা গুহা। সেখানে এক তরুণ চিত্র- শিল্পী গুহা গাত্রে খোদিত এক বেণু-বাদিনী রমণী মূর্ত্তির চিত্র আঁকিয়া লইতে ব্যাপৃত। দূরে এক রাজশিবির স্থাপিত হইয়াছে শিবিরের অগ্রভাগ দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

শান্ত অপরাহ্ন। আশে পাশে কয়েকটী গাছ। স্থানটী অতি নির্জ্জন।

চিত্রকর চিত্র আঁকিয়া যাইতেছেন। দূরে বেণু বাজিতেছে, তাহাতে চিত্রকরের তন্ময়তা ভঙ্গ হইতেছে। মাঝে মাঝে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন, আবার চিত্রাঙ্কনে ব্যাপৃত হইতেছেন। ক্রমে বেণুধ্বনি নিকট হইতে নিকটতর হইতেছে। চিত্রকর তুলি রাখিয়া সেইদিকে তাকাইয়া শুনিতে লাগিলেন, হয় ত কাহারো প্রতীক্ষাও করিতে লাগিলেন, কিন্তু, হঠাৎ বেণুধ্বনি বন্ধ হইয়া গেল। চিত্রকর তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার চিত্রাঙ্কনে রত হইলেন।

হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার চোখ ধরিল। চিত্রকর ঘুরিয়া তাকাইতেই দেখিতে পাইলেন এক তরুণী . . . অপরূপা তরুণী। মুখে হাসি, হাতে বেণু, পাশে একটি গো-বৎস, দূরে একটি গাভী। . . .]

* * *

চিত্রকর ॥ [সবিস্ময়ে] সে কি!

তরুণী ॥ [সবিস্ময়ে] এ কি!

চিত্রকর ॥ কে তুমি!

তরুণী ॥ তুমিই বা কে?

চিত্রকর ॥ আমি চিত্রকর। . . . কিন্তু . . . তুমি?

তরুণী ॥ আমি বেণু।

চিত্রকর ॥ বেণু! . . . হাঁ, হাতে বেণুই রয়েছে বটে! কিন্তু . . . কিন্তু . . .

তরুণী ॥ তারা আমায় বেণুবাদিনী বলে ডাকে।

চিত্রকর ॥ তোমার ঘর কোথায়?

বেণুবাদিনী ॥ ঐ . . . ঐ পাশের গ্রামে।

চিত্রকর ॥ এখানে কেন?

বেণুবাদিনী ॥ তুমি এখানে কেন?

চিত্রকর ॥ আমি চিত্রকর। অজন্তার ছবি দেখে ছবি এঁকে নিতে এসেছি।

বেণুবাদিনী ॥ আমি গরু চরাতে এসেছি।

চিত্রকর ॥ আমার চোখ ধরলে কেন?

বেণুবাদিনী ॥ আমি ভুল করেছি! আমায় ক্ষমা ক'রো—আর কখনও ধরব না, আমি ভুল করেছি! আমি চললুম। . . . ধবলি! চল . . . কাজলি! আয়—

[চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল]

চিত্রকর ॥ . . . শোন—

বেণুবাদিনী ॥ . . . না। [কিন্তু হঠাৎ তাঁহার দিকে ফিরিয়া] এখানে কোন রাখাল এসেছিল দেখেছ?

* এই দৃশ্য পরিকল্পনাটুকু প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয়ের দান।—মন্মথ রায়।

চিত্রকর॥ না।

বেণুবাদিনী॥ সে বলেছিল সে আসবে। তার শ্যামলী ওখানে চ'রে বেড়াচ্ছে, অথচ তাকে খুঁজে পাচ্ছিনে। আমি ভেবেছিলুম..., না, আমি ভুল করেছি, আমাকে ক্ষমা ক'রো। সে নিশ্চয়ই আবার ঐ রাজার শিবির দেখ্‌তে গেছে!—[আবার চলিতে লাগিল]

চিত্রকর॥ বেণুবাদিনী! বেণুবাদিনী! শোন—

বেণুবাদিনী॥ না, আমার ভয় কর্ছে।

চিত্রকর॥ আমি তোমার রাখালকে খুঁজে দিচ্ছি। তুমি শোন—

বেণুবাদিনী॥ বল...

চিত্রকর॥ কাছে এস...

বেণুবাদিনী॥ না—

চিত্রকর॥ [অগ্রসর হইয়া] তোমার রাখাল কি বেণু বাজাচ্ছিল?

বেণুবাদিনী॥ কেন? ... বেণু কি আমি বাজাতে জানি নে? সে নিজেই বলে আমিই তার সকল সুরের ভাণ্ডারী! হাঁ!

চিত্রকর॥ তবে বেণু তুমিই বাজাচ্ছিলে?

বেণুবাদিনী॥ হাঁ, আমি। কিন্তু, আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনে... আমি আসি—[প্রস্থানোদ্যত]

চিত্রকর॥ শোন। সে দেখতে কেমন বল...

বেণুবাদিনী॥ [যাইতেছিল, শুনিয়া ফিরিল, কিন্ত, তখনই আবার ফিরিয়া চলিতে লাগিল।]

চিত্রকর॥ বল... আমি খুঁজে বের কর্ব্ব...

বেণুবাদিনী॥ না! ...পার্ব্বে না!... না!

চিত্রকর॥ কেন?

বেণুবাদিনী॥ [ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া] আমার ভয় করছে!... পার্ব্বে তুমি?

চিত্রকর॥ কোন ভয় নেই। বেণুবাদিনী! কোনটি তোমার ধবলী, কোনটি তোমার শ্যামলী?

বেণুবাদিনী॥ এইটি ধবলী এইটি কাজলী, শ্যামলী আমার নয়।

চিত্রকর॥ শ্যামলী কার?

বেণুবাদিনী॥ তারি।

চিত্রকর॥ কার? সেই রাখালের?

বেণুবাদিনী॥ হাঁ। [আবার চলিতে লাগিল।]

চিত্রকর॥ আমি বলব তোমার রাখাল দেখতে কেমন?

বেণুবাদিনী॥ [শুনিয়াই হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া] তবে তুমি তাকে দেখেছ!

চিত্রকর॥—তার রং কালো—

বেণুবাদিনী॥—হ'ল না। তার রং লোকে বলে কাঁচা সোণার মত!

চিত্রকর॥ কাঁচা সোণার মত কি রং হয়?

বেণুবাদিনী॥—তবে তোমার হ'ল কি করে?

চিত্রকর॥ ... আচ্ছা বেশ। তার চোখ দুটো কটা—বিড়ালের চোখের মত!

বেণুবাদিনী॥—তোমার চোখ বুঝি বিড়ালের মত?

চিত্রকর॥ সে তুমি জান!—

বেণুবাদিনী॥—অত গর্ব্ব করতে হবে না! তার চোখ ঠিক তোমার মত! লোকে বলে সে যেন হরিণের চোখ!

চিত্রকর॥... বুঝলুম। কিন্তু... সে দেখতে কি সুন্দর? বোধ হয়,—না।

বেণুবাদিনী॥ তবে তুমিও দেখ্‌তে বিশ্রী! অত কথায় কাজ নেই! সে তোমারি মত দেখ্‌তে!

চিত্রকর॥—আমারি মত?

বেণুবাদিনী॥—ঠিক তোমারি মত। ... সেইজন্যই তো আমি ভুল করেছিলুম! আমাকে ক্ষমা ক'রো! ... আমি চললুম!

চিত্রকর॥ শোন... শোন...!

বেণুবাদিনী॥ তুমি কে? ... কেন আমায় পিছু ডাকছ?

চিত্রকর॥ আমি চিত্রকর।... এই দেখ তোমার ছবি এঁকে ফেলেছি! এই দেখ...

[অঙ্কিত চিত্র দেখাইলেন]

বেণুবাদিনী ॥ [দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। বিস্ময়ে অগ্রসর হইয়া, পরে দেখিবার প্রলোভন জয় করিতে চাহিয়াও পারিল না। ত্বরিৎপদে কাছে আসিয়া ছবি দেখিল এবং পরে চিত্রকরের মুখের দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইল।]

চিত্রকর ॥—দেখলে ?

বেণুবাদিনী ॥ দেখলুম।

চিত্রকর ॥ . . . তুমি ?

বেণুবাদিনী ॥ [কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না।]

চিত্রকর ॥ এই দেখ তোমার মুখখানি! এই দেখ তোমার চোখ দুটী! . . . এই দেখ তোমার চুল! আর এই দেখ তোমার হাতের বেণু! . . .

বেণুবাদিনী ॥—কিন্তু সবই যেন ছায়া! স্পষ্ট হয় নি। রাখাল বলে . . .

চিত্রকর ॥—কি বলে ?

বেণুবাদিনী ॥ রাখাল বলে, . . . না, তুমি হাসবে!

চিত্রকর ॥ না, না . . . বল . . .

বেণুবাদিনী ॥—তাকে ব'লোনা—

চিত্রকর ॥ না—, বলবো না...

বেণুবাদিনী ॥ [চারিদিকে তাকাইয়া দেখিয়া প্রথমে আশ্বস্ত হইল যে কাছে আর কেহ শুনিবার নাই]—ঐ গুহার ছবি দেখেছ ?

চিত্রকর ॥—তাই দেখেই তো ছবি আঁকছি!

বেণুবাদিনী ॥···ঐ যে পাথরের গায়ে আঁকা.. ঐ বেণুবাদিনী...

চিত্রকর ॥ হাঁ, ঐ বেণুবাদিনী...

বেণুবাদিনী ॥ ও কি আমার মত দেখতে ?

চিত্রকর ॥—অবিকল! আমি অবাক হয়ে গেছি! ওরই ছবি আমি এঁকে নিচ্ছিলুম, কিন্তু, এখন মনে হচ্ছে, আমি তোমারি ছবি এঁকেছি!

বেণুবাদিনী ॥ সেও তাই বলে। বলে ঐ বেণুবাদিনী ...আমি!...কিন্তু তুমিই বল দেখি...তাও কি হয় ?

চিত্রকর ॥ সে হয় তো সত্য কথাই বলেছে।···সে কে ? কোথায় থাকে ?

বেণুবাদিনী ॥ তা শুনলে আরো অবাক হবে। সে এই গুহার আশে পাশেই থাকে, গরু চরায়, বেণু বাজায়, গান করে, আর ক্ষিধে পেলে গরুর দুধ খায়।

চিত্রকর ॥ তার বাড়ী কোথায় ?

বেণুবাদিনী ॥ তা তার মনে নেই।...ভারী মজার লোক সে!

চিত্রকর ॥ কেন ?

বেণুবাদিনী ॥ কখনো বলে সে রাজার ছেলে ছিল, কখনো বলে সে দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা ছিল,...দেশে দেশে যুদ্ধ করে বেড়িয়েছে, কখনো বলে সে রাজ সভার গায়ক ছিল,···কখনো বলে সে ছিল মহাকবি···কখনো বা বলে সে তোমারি মত চিত্রকর ছিল!

চিত্রকর ॥ তার কোন কথাটা সত্যি ?

বেণুবাদিনী ॥ এখন আমিও বলতে পাচ্ছিনে, কিন্তু, সে যখন আমার চোখে চোখে চেয়ে বলে, আমার মনে হয় তার সব কথাই সত্যি! উঃ সে যখন বলে তখন যদি তাকে দেখতে! তার চোখ দুটি আগুনের মত জলে! কিন্তু লোকে তা বোঝে না, লোকে তাকে বলে...পাগল!

চিত্রকর ॥ পাগল! পাগল! হাঁ, পাগল।...তা যাক্···কিন্তু, আমার একটা কথা শুনবে ?

বেণুবাদিনী ॥ কি ?

চিত্রকর ॥ রাখবে বল ?

বেণুবাদিনী ॥ আগে বল—

চিত্রকর ॥ তুমি এইখানটায় ব'সো—

বেণুবাদিনী ॥ কেন ?

চিত্রকর ॥ এখনো তো বেলা যায় নি!

বেণুবাদিনী ॥ কিন্তু তাকে যে খুঁজে বের কর্ত্তে হবে!

চিত্রকর ॥ তাকে এখানে নিয়ে আসবার একটা খুব সহজ উপায় আছে।

বেণুবাদিনী ॥ কি ?

চিত্রকর ॥ তাকে আমি এখানে এখনি এনে দিতে পারি...

বেণুবাদিনী ॥ আনো...আনো···

চিত্রকর ॥ তবে আমার কথা রাখ...

বেণুবাদিনী ॥ বেশ, এই বসলুম! [এক খণ্ড শিলার উপর বসিল।]

চিত্রকর ॥ এইবার তোমার বেণু বাজাও—

বেণুবাদিনী ॥ কেন?

চিত্রকর ॥ আমি শুনব। তুমি ঐ পাথরের উপরে বসে বেণু বাজাচ্ছ...বেণুর স্বরে পৃথিবীতে আগুন লেগেছে...সে যে কি রূপ··· কি রং...আমি তোমার ঐ ছবি দেখে আমার এই ছবি সম্পূর্ণ কর্ব্ব!

বেণুবাদিনী ॥ [উঠিয়া] আমি চললুম!

চিত্রকর ॥ উঠোনা...উঠোনা···

বেণুবাদিনী ॥ কাজলি!

চিত্রকর ॥ দয়া কর...দয়া কর...

বেণুবাদিনী ॥ ধবলি!

চিত্রকর ॥ কিন্তু শোনো...সেও হয়তো তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তোমার বেণুর স্বরে সে এখানে চলে আসবে!

বেণুবাদিনী ॥ [ভাবিয়া] সে কথা বলতে হয়!

[পুনরায় শিলাখণ্ডে বসিয়া বেণু বাজাইতে আরম্ভ করিল।]

[চিত্রকর রং ও তুলি লইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া তাহার ছবি আঁকিতে লাগিলেন।]

বেণুবাদিনী ॥ [বেণুতে একটি গান বাজানো শেষ হইলেই চাহিয়া দেখে চিত্রকর তাহার ছবি আঁকিতেছেন—দেখিয়াই] সর্ব্বনাশ! আবার! আমাকে না মেরে তুমি ছাড়বে না? [উঠিয়া দাঁড়াইল।]

চিত্রকর ॥ সে কি?

বেণুবাদিনী ॥ [বিকৃত স্বরে] সে—কি!

চিত্রকর ॥ কি হ'ল?

বেণুবাদিনী ॥ সে এলো কই?

চিত্রকর ॥ সে তবে আশে পাশে নেই।...কিন্তু, দোহাই তোমার, আর এটু ব'সো—

বেণুবাদিনী ॥ হাঁ, সে আসে পাশে নেই-ই বটে। সে যখন আমার বেণু শুনেও এলো না, সে নিশ্চয়, সেই মণির ওখানে গেছে।

চিত্রকর ॥ মণি?

বেণুবাদিনী ॥ হাঁ, মণি। বুড়ো অজগরের মাথার মণি—

চিত্রকর ॥ সে কি!

বেণুবাদিনী ॥ অজগরের মাথায় মণি থাকে না? তুমি তবে কী জান?

চিত্রকর ॥ না, আমি জানিনে। তুমি বল...

বেণুবাদিনী ॥—শুধু শুধুই ছবি আঁকতে এসেছ! এ মণির কথা কে না জানে! ঐ যে ওখানে রাজপুত্র এসেছে...সেও কি শুধু শুধুই ওখানে শিবির খাড়া করে বসে থাকতে এসেছে?

চিত্রকর ॥ রাজপুত্র তো অজন্তা গুহা দেখতে এসেছে!

বেণুবাদিনী ॥ তুমি বললেই হ'ল!...ঐ মণি···ঐ মণি!...উঃ কি তার তেজ!···রাত্রে যখন জ্বলে সারাটা বনে যেন জ্যোস্না উঠেছে মনে হয়। ঐ অজগরের বয়স কত জান?

চিত্রকর ॥ কত?

বেণুবাদিনী ॥ কেউ বলে একশ', কেউ বলে আড়াই শ'। আমাদের গোবর্দ্ধন বলে দু'শ' একান্ন। খুকী বলে হাজার। কিন্তু আমার তা বিশ্বাস হয় না। রাখাল বলে...

চিত্রকর ॥ হাঁ, সে কি বলে?

বেণুবাদিনী ॥ রাখাল বলে ওর বয়স নেই। আমি বলি সেও কি হয়? সে বলে তবে ওর বয়স এই গুহার বয়সেরও বেশী। আমি বলি গুহার বয়স কত? সে বলে তা সে জানে না। তবে গুহার বয়স গুহার মধ্যকার ছবির বয়সের চাইতে কম, অনেক কম।···কিন্তু ঐ খানেই তার পাগলামি, সে কি হয়?

চিত্রকর ॥ এখন বুঝি ঐ মণির ওপর সকলের লোভ?

বেণুবাদিনী ॥ হাঁ, সকলেরই লোভ। কিন্তু, তার মধ্যেও একটা রহস্য আছে। সে জানে শুধু ঐ রাখাল। তবে আমাকে তার আভাস দিয়েছে—

চিত্রকর ॥ আমায় তা বলনা কেন? ...আমি কাউকেও বলব না...

বেণুবাদিনী ॥ না, তুমি বলে দেবে...

চিত্রকর ॥ বেশ, যদি কাউকে বলি, তবে তুমি আর আমার সঙ্গে কথা কয়ো না...

বেণুবাদিনী ॥ কি-ই বা তাতে তোমার এল গেল?

চিত্রকর ॥ বুঝলুম। রাখাল তবে তোমাকে যা তা বলে ভুলিয়ে রেখেছে—তুমিও পাগলের কথাতেই ভুলে আছ! চমৎকার!

বেণুবাদিনী ॥ পাগলের কথাতে ভুলে আছি?... শুনবে?...শোন...

চিত্রকর ॥ বল—

বেণুবাদিনী ॥ তোমার চোখ আছে?

চিত্রকর ॥ তবে তোমায় দেখছি কেমন করে?

বেণুবাদিনী ॥ ঐ আমাকেই দেখ্‌ছ!...ঐ গুহার ঐ বেণুবাদিনীর ছবি ভালো করে দেখেছ?

চিত্রকর ॥ দেখেছি!

বেণুবাদিনী ॥ দেখেছ?...বেশ, ...বল দেখি ওর কি নেই?

চিত্রকর ॥ ওতে প্রাণ নেই—

বেণুবাদিনী ॥ আ—হা—হা! কি কথাটাই বললে! প্রাণ নেই!...আরে পাগল! পাষাণের কি প্রাণ থাকে?

চিত্রকর ॥ বেশ, তুমিই বল ওর কি নেই!

বেণুবাদিনী ॥ ওর মাথায় দেখ দেখি...একটু যায়গা ভাঙা...দেখছ?

চিত্রকর ॥ ...দেখেছি।

বেণুবাদিনী ॥—তবে বললে না কেন?

চিত্রকর ॥ ও রকম ভাঙা অনেক যায়গায় রয়েছে!

বেণুবাদিনী ॥ কিন্তু ওখানে যে ওর মাথার মণি ছিল! সেই মণি এখন অজগরের মাথায়!

চিত্রকর ॥ বটে!

বেণুবাদিনী ॥ বটে নয়তো কি!...কিন্তু, এও তো আসল রহস্য নয়! সেতো এখনো বলি নি!

চিত্রকর ॥ বল—

বেণুবাদিনী ॥ না...না...এখন নয়, এখন আমাকে তার খোঁজে যেতে হবে...

চিত্রকর ॥ তুমি বল।...আমিও তার খোঁজে যাব...

বেণুবাদিনী ॥ তার জন্য আমার মন বড় উতলা হয়েছে, সে আজ হয়তো সেই অজগরের ওখানে গিয়েছে!

চিত্রকর ॥ কেন?

বেণুবাদিনী ॥......ঐ......[শিবিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া]...দেখছ না?

চিত্রকর ॥ কি?

বেণুবাদিনী ॥ রাজপুত্রের শিবির!

চিত্রকর ॥ হাঁ—

বেণুবাদিনী ॥ রাজপুত্র সেই মণি অজগরের মাথা হতে নিয়ে ঐ বেণুবাদিনীর মাথায় পরিয়ে দেবে...দিলে—

চিত্রকর ॥—দিলে কি হবে?

বেণুবাদিনী ॥ রাখাল বলে ঐ বেণুবাদিনী জীবন্ত হয়ে উঠে রাজপুত্রকে ধরা দেবে—

চিত্রকর ॥ হাঃ হাঃ হাঃ

বেণুবাদিনী ॥ হেসোনা...আমার গা শিউরে উঠ্‌ছে। ...ওগো, আমার ভয় কর্চ্ছে!

চিত্রকর ॥ ভয় কি?

বেণুবাদিনী ॥ আমি সেই কথা শুনে তাকে বলেছিলুম ঐ হারা-মণি আমাকে দিতে হবে।...মণিটা খুব জ্বলে, আঁধারে চাঁদের মত জ্বলে, আমার লোভ হয়েছিল।... আমি চেয়েছিলুম!...আজ সেই মণি, রাজপুত্র যদি তার আগে নিয়ে নেয়, এই মনে করে, সে নিশ্চয় অজগরের ওখানে গেছে, কিন্তু,...সে তো অজগর নয়, সাক্ষাৎ যম!

চিত্রকর ॥ এই কথা?...কিন্তু, এ কথা পূর্ব্বে আমায় বলনি কেন?

বেণুবাদিনী ॥ তখন ভেবেছিলুম, সে আমাকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাবে। এখন তার বিলম্ব দেখে মনে হচ্ছে সে একলাই চলে গেছে!

চিত্রকর ॥ তুমি এইখানে থাক। আমি চললুম—

বেণুবাদিনী ॥ কোথায়?

চিত্রকর ॥ ঐ বনের মাঝে...যেখানে সে গেছে—

বেণুবাদিনী ॥ আমিও আসি—

চিত্রকর ॥ না—

বেণুবাদিনী ॥ কেন? কেন?

চিত্রকর ॥ তবে তোমাকে সামলাতে গিয়ে তাকেও বাঁচাতে পারবনা, আমরাও মরব! আমার কথা রাখো… তুমি এইখানে আমার প্রতীক্ষা কর।…আমি তাকে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে আনব! [প্রস্থানোদ্যত—

বেণুবাদিনী ॥ ওগো, দাঁড়াও—

চিত্রকর ॥ কি?

বেণুবাদিনী ॥ তাকে ফিরিয়ে আনবার সময়, যদি পারো,…একবার চেষ্টা করে দেখো…যদি মণিটি আনতে পার!—অমন মণি আর হয় না!

চিত্রকর ॥…যদি আনতে পারি—

বেণুবাদিনী ॥—যা চাইবে তাই দেব—

চিত্রকর ॥—সত্যি?

বেণুবাদিনী ॥ সত্যি।

চিত্রকর ॥…তবে তুমি বেণু বাজাও…আমি তারি তালে তালে ছুটি—কই, বাজাও…

বেণুবাদিনী ॥ [তৎক্ষণাৎ বেণুবাদ্য আরম্ভ করিল। চিত্রকর চলিয়া গেলেন। মনে হইল আকাশে বাতাসে বেণুর লীলায়িত ধ্বনি নৃত্য করিতে লাগিল। গাভী দুটি বেণুবাদিনীর পায়ের কাছে শুইয়া পড়িয়া নিমীলিত চোখে রোমন্থন করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিল। তাহার বেণুবাদ্য শেষ হইলে সে সম্মুখে চাহিয়া দেখে বিস্ময়াবিষ্ট রাজপুত্র একটা গাছে ভর দিয়া তাহার দিকে অপলক চোখে তাকাইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বেণুবাদিনী ছুটিয়া তাঁহার কাছে যাইয়া তাঁহার হাত জড়াইয়া ধরিয়া]…তুমি এসেছ! তবে তুমি মণি এনেছ?

রাজপুত্র ॥ না—

বেণুবাদিনী ॥ কেন?

রাজপুত্র ॥ অজগর যে কোথায় রয়েছে খুঁজে পেলুম না। কিন্তু তার গর্জ্জন শুনতে পাচ্ছিলুম। এক পাগল…

বেণুবাদিনী ॥ [রুদ্ধনিঃশ্বাসে]…পাগল! তবে সে সেখানে গিয়েছিল?

রাজপুত্র ॥ কে?

বেণুবাদিনী ॥ আমাদের রাখাল—

রাজপুত্র ॥ রাখাল কে জানিনে, তবে, সে সত্য সত্যই পাগল…নইলে—

বেণুবাদিনী ॥ বল…বল…সে কি করেছে…কোথায় আছে, কেমন আছে, মণি কি পেয়েছে?

রাজপুত্র ॥ সে মরেছে—

বেণুবাদিনী ॥ [চীৎকার করিয়া উঠিল] মরেছে?

রাজপুত্র ॥ যদিও না মরে থাকে, মর্ব্বার আর বাকী নেই!

বেণুবাদিনী ॥ তবে মরেনি?

রাজপুত্র ॥ জানিনে।…আমরা যখন সেখানে গেলুম সে চীৎকার করে উঠল "বিষ! বিষ! বিষ!" তার চোখ মুখ আগুনের মত জ্বলছিল!

বেণুবাদিনী ॥ সে কি তখন আমার কথা কিছু বলেছিল?

রাজপুত্র ॥ কিছু না। কিছু মাত্র না।

বেণুবাদিনী ॥ মিথ্যা কথা!…কোথায় সে! আমি তাকে দেখে নেব!…আমি চললুম!

রাজপুত্র ॥…দাঁড়াও।

বেণুবাদিনী ॥ না, আর নয়…

রাজপুত্র ॥ তার খবর শোন—

বেণুবাদিনী ॥ কিন্তু তা তুমি বল কই?

রাজপুত্র ॥ তুমি আমায় বিশ্বাস কর্ব্বে?

বেণুবাদিনী ॥ তুমি তবে মিথ্যাও বলে থাক?

রাজপুত্র ॥ তোমার কাছে মিথ্যা বলব না। সেই পাগল অজগরের বিষেও মরে নি…সে কি মন্ত্র জানতো।

বেণুবাদিনী ॥ জানতো! জানতো! সে মন্ত্র জানতো!…আমি শিখতে চেয়েছিলুম, সে তাতে শুধু হাসতো!

রাজপুত্র ॥ মরতে মরতেও সে সেই মন্ত্রের জোরে বেঁচে গেছে! কিন্তু…

বেণুবাদিনী ॥ কিন্তু?

রাজপুত্র ॥…এখন আর তাকে চেনবার উপায় নেই! তার চেহারা বদলে গেছে!…সেই লোকের ভিড়ে সে যে কোন আড়ালে কোথায় মিশে গেল আর তার খোঁজ পেলুম না…

বেণুবাদিনী ॥ সত্যি?

রাজপুত্র ॥ তুমিই না হয় একবার খুঁজে দেখো—

বেণুবাদিনী ॥ সে ধরা না দিলে তাকে লুকোচুরি খেলায় কোন দিনই ধরতে পারিনি...আর আজ...আজ কেমন করে পার্ব্ব!

রাজপুত্র ॥... আমাদের চিত্রকর তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ...তুমি নাকি তাকে পাঠিয়েছ?

বেণুবাদিনী ॥ হাঁ, সে খুঁজতে গেছে, কিন্তু, তুমি যখন পারনি, সে-ই বা কেমন করে তাকে খুঁজে বের কর্বে?

রাজপুত্র ॥...কিন্তু, আমি যা পারি নি, সে তা পেরেছে—

বেণুবাদিনী ॥ কি? মণি কেড়ে নিয়েছে?

রাজপুত্র ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ।

বেণুবাদিনী ॥ তবে?

রাজপুত্র ॥ সে সেই পাগলের বাঁশীটি কুড়িয়ে পেয়েছে! অথচ ওটা আমার চোখেই পড়েনি!

বেণুবাদিনী ॥ পেয়েছে? পেয়েছে? সে পেয়েছে?

রাজপুত্র ॥—পেয়েছে। পেয়ে, সে বাঁশী বাজাচ্ছে! ...অজগরের গর্জ্জন থেমে গেছে,—কি যেন একটা অঘটন ঘটন হয়।

বেণুবাদিনী ॥ আমি ভাবতে পাচ্ছিনে! আমার ভয় কর্ছে!...কি হবে রাজা?

রাজপুত্র ॥ আমিও বলতে পারি নে।..... কিন্তু বেণুবাদিনি! তুমি কি এখনো মণিটি চাও?

বেণুবাদিনী ॥ ওঃ [একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় আহত হইয়া রাজপুত্রের বুকে মুখ লুকাইল।]

রাজপুত্র ॥ চাও তুমি?

বেণুবাদিনী ॥ [মুখ তুলিয়া]...চিত্রকরকে ডেকে আন।

রাজপুত্র ॥ কেন?

বেণুবাদিনী ॥ সে বাঁচুক! আমি তার মরণ চাই নে!

রাজপুত্র ॥ ভালো কথা।...তবে আমার নিবেদন শোন—

বেণুবাদিনী ॥ শিগগীর বলে যাও রাজা—

রাজপুত্র ॥ আমি তোমায় মণি দেব...

বেণুবাদিনী ॥ কিন্তু ঐ অজগর?

রাজপুত্র। অজগরের মণি নয়, সাত রাজার ধন এক মাণিক...আমার রাজ প্রাসাদের পাতালপুরীর আঁধার ঘর আলো করে রয়েছে!

বেণুবাদিনী ॥ সেখানে অজগর নেই?

রাজপুত্র ॥ না। আমার যে রাণী হবে, ঐ মাণিক হবে তারই রাজ-টীকা।...যাবে?

বেণুবাদিনী। এই অজগরের মণির মত সে মাণিক?

রাজপুত্র ॥ দুটো জিনিষ কি কখনো ঠিক এক রকম হয়?...হয় না। তবে, হাঁ, সে মাণিকও কম নয়...

বেণুবাদিনী ॥...কিন্তু যদি তাতে আমার মন না ওঠে?

রাজপুত্র ॥ মন হয় তো আমারো উঠবেনা! তখনই হবে অজগরের বিরুদ্ধে আমার সত্যিকার অভিযান।... সেবার হয় জয়, না হয় মৃত্যু...তখন আর কোন ক্ষোভ রইবে না!

বেণুবাদিনী ॥ তবে এইবার চিত্রকরকে ডাকো...

রাজপুত্র ॥ রাণী!

বেণুবাদিনী ॥ রাজা!

রাজপুত্র ॥ অজন্তা গুহা আজ জীবন্ত হয়ে উঠেছে!... এইবার তোমার বেণুটি বাজাও!

বেণুবাদিনী ॥ বেণু বাজছে!

রাজপুত্র ॥ কই?

বেণুবাদিনী ॥ ঐ—

[দুইজনে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। দূর হইতে বাঁশীর স্বর ভাসিয়া আসিতেছিল। স্বর ক্রমে নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল।]

বেণুবাদিনী ॥ রাখাল! রাখাল!

রাজপুত্র ॥ চিত্রকর!...হাঁ,...সে!

[চিত্রকরের প্রবেশ]

চিত্রকর ॥ হাঁ, আমি।

বেণুবাদিনী ॥ মণি? মণি পেয়েছ?

চিত্রকর ॥ না...পাইনি।...

বেণুবাদিনী ॥ তবে?

চিত্রকর॥ বাঁশী পেয়েছি।

[কিন্তু চিত্রকর কাহারও নিকট হইতে তাঁহার কথার প্রত্যুত্তর পাইলেন না। মুহূর্ত্তকাল গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিল।]

চিত্রকর॥ সেই রাখালের খবর শুনেছ?

রাজপুত্র॥ আমি বলেছি।

বেণুবাদিনী॥ কাজলি! ধবলি!…ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে!…ওরে, তোরা ওঠ্!…এখন যে যেতে হবে!

[তাহাদের লইয়া ব্যাপৃত রহিল।]

রাজপুত্র॥ [চিত্রকরের প্রতি] বন্ধু! অজন্তার এই বেণুবাদিনীর খোঁজ দিয়েছিলে তুমি, আগ্রহ ক'রে আমায় সঙ্গেও এনেছিলে তুমি! আজ তোমারি প্রসাদে আমি তাকে জয় করেছি, সে আজ আমার রাণী!… তোমার এ ঋণ জীবনে ভুলব না আমি!…আজ কি তোমার কোন কামনা আছে?

চিত্রকর॥ কামনা?…শিল্পশাস্ত্রের প্রথম কথাই হচ্ছে অতৃপ্ত কামনা।…

রাজপুত্র॥—হেঁয়ালি রেখে সোজা কথায় বল বন্ধু তুমি কি চাও?

চিত্রকর॥—দেবে?

রাজপুত্র॥ কবে, কি…তোমাকে দিই নি?

চিত্রকর॥ আমি বেণুবাদিনীর ছবি আঁকছিলুম, বেণুবাদিনী বসেছিল ঐ শিলাখণ্ডের উপরে, হাতে ছিল তার বেণু, সে সেই বেণু বাজাচ্ছিল, পাশে ছিল তার ঐ কাজলী, ঐ ধবলী …চোখ বুঁজে সুখে রোমন্থন করছিল!…আমি শুধু তার মুখখানি এঁকেছি, এমন সময় ঝড় উঠল…সব ওলোট-পালট হয়ে গেল! আমার ছবি শেষ হয় নি, বিশ্বের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ ক'রে প্রকাশ কর্ত্তে পারি নি!…আমায় সেই অসম্পূর্ণ ছবি সম্পূর্ণ কর্ত্তে দাও!

রাজপুত্র॥ তা কি পার্ব্বে?

চিত্রকর॥ পার্ব্ব, আমি পার্ব্ব। পার্ব্ব কিনা তার নমুনা দেখ— [অসম্পূর্ণ চিত্র দেখাইলেন।]

রাজপুত্র॥ হাঁ, পার্ব্বে, তুমি পার্ব্বে। অজন্তার ঐ চিত্রকে তুমি জীবন্ত করেছ! ঐ বেণুবাদিনী অমর হয়ে রইবে, তার চিত্রকর অমর হয়ে রইবে…আমি তার অন্তরায় হব না। চল…রাজপ্রাসাদে বসে তার ছবি নিয়ো…

চিত্রকর॥ না—না—না!

রাজপুত্র॥ তবে?

চিত্রকর॥ রাজপ্রাসাদে সে রাজরাণী! আমি যে এই বেণুবাদিনীর ছবি চাই বন্ধু!

রাজপুত্র॥…বেণু! একি!…ঐ দেখ বন্ধু, সে তার গাভী দুটিকে কি গভীর স্নেহে কচিপাতা খাওয়াচ্ছে!…

চিত্রকর॥ ঐ সে আসছে…

রাজপুত্র॥ হাঁ, আসছে। এলেই তুমি তার ছবির রেখা নাও। আমি শিবিরে খবর দিয়ে আসি…শোভাযাত্রা করে আমরা গোধূলিতে যাত্রা কর্ব্ব!…এই যে রাণী! আমি শোভাযাত্রার আলোর ব্যবস্থা কর্ত্তে গেলুম, তুমি আমার বন্ধুর কামনাটুকু পূর্ণ কর…

[প্রস্থান।]

বেণুবাদিনী॥ সন্ধ্যা কি এল?

চিত্রকর॥ পশ্চিমের দিক লালে লাল হয়ে গেছে!

বেণুবাদিনী।…ঠিক যেন রক্ত!…না?

চিত্রকর॥ রক্ত কি না জানি না, তবে রং বটে! ঐ রং-এ তোমার ছবি আঁকবো…

বেণুবাদিনী॥ আমার ছবি!

চিত্রকর॥ হাঁ, তোমার। কেন? তোমাকে তো সে ছবি দেখিয়েছি!…এই দেখ তোমার মুখখানির রূপরেখা!

বেণুবাদিনী॥…ঐ থাক্…আর নয়! আর নয়! আর নয়!

চিত্রকর॥ তোমার মুখ দেখেছি, কিন্তু…

বেণুবাদিনী।…কিন্তু?

চিত্রকর॥…আর কিছু দেখি নি!…

বেণুবাদিনী॥—চিত্রকর!

চিত্রকর॥…হাঁ,…দেখি নি!…তোমার সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য আমি পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্বে নিবেদন করে যাব। …দয়া কর!

বেণুবাদিনী॥—মণি! আমার মণি কই?

চিত্রকর ॥...পাই নি!

বেণুবাদিনী ॥—তুমি বলেছিলে আমায় দেবে! আমি বলেছিলুম, দিলে. .তুমি যা চাইবে আমি তা-ই দেব!... মণি কই?

চিত্রকর ॥...পাই নি!

বেণুবাদিনী ॥ ঠিক। মণি সেও দিতে চেয়েছিল, ...দিতে পারে নি, কিন্তু...প্রাণ দিয়েছে!

চিত্রকর ॥...প্রাণ আমিও দিতে পার্ত্তুম, কিন্তু... দিলুম না...দিলে অজগরের জয় হ'ত, পৃথিবীর ক্ষতি হ'ত। আমি ঠক্‌বার পাত্র নই—আমি বাঁশী বাজাতে বাজাতে ফিরে এসে, তোমাকে সম্মুখে রেখে হাতে রং আর তুলি নিয়েছি!

বেণুবাদিনী ॥...মণি! অজগরের মাথার মণি!...ঐ মণির কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছি নে!

চিত্রকর ॥ ঐ শিলাখণ্ডের উপর তেমনি করে ব'সো। বেণুটি হাতে নাও...এখানে এখন কেউ আসবে না! বাতাসে বসন উড়ুক! আমার ছবি সম্পূর্ণ হোক্... শেষ হোক্...

বেণুবাদিনী ॥ "শেষ হোক্!"......বল কি? আমায় মার্ত্তে চাও?

চিত্রকর ॥ সে কি দেবী!

বেণুবাদিনী ॥ রাখাল ব'লে গেছে শেষ হওয়া আর মরা একই কথা! আমার ভয় কর্চ্ছে!...তার কথা কখনো মিথ্যা হয় নি! শেষ হওয়া আর মরা একই কথা! হাঁ একই কথা!

চিত্রকর ॥ সে ছিল এক পাগল! তার কথা বিশ্বাসের নয়!...

বেণুবাদিনী ॥—বিশ্বাসের নয়?

চিত্রকর ॥—না।

বেণুবাদিনী ॥ আর সে যদি নিজে এসে বলে তোমার কথা-ই বিশ্বাসের নয়?

চিত্রকর ॥ তা কি হ'তে পারে? সে আর নেই! সে আসবে কেমন করে?

বেণুবাদিনী ॥...তার বাঁশীটি আমায় দাও...আমি তার বাঁশী বাজালেই সে যেখানেই থাকুক, ছুটে আস্‌বে! সে যে এ রকম কতবার এসেছে!

চিত্রকর ॥ [হাসিয়া] এই নাও...[বাঁশী দান।]

বেণুবাদিনী ॥ চোখ বোঁজ...এমন খেলা আমরা কত খেলেছি! হাঁ, তোমার আসনে গিয়ে ব'সো। চোখ বোঁজ...চোখ বোঁজ...

চিত্রকর ॥ [হাসিয়া] বেশ, চোখ বুঁজলুম।

[কৌতুকভরে চোখে মুখে হাসি লইয়া বেণুবাদিনী বাঁশী বাজাইতে শুরু করিয়া চোরের মত মৃদুপাদক্ষেপে অজন্তা গুহার মাঝখানে চলিয়া গিয়া অদৃশ্য হইল। চিত্রকরের ভাব দেখিয়া মনে হইল, তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই গুহার পাশ দিয়া এক রাখাল বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে বাহির হইয়া আসিল, এবং ক্ষণ পরে বাঁশী রাখিয়া গরুগুলিকে ডাকিতে লাগিল—"আয়! আয়!"

এমন সময় এক রাজদূত আসিয়া উপস্থিত।]

রাজদূত ॥ ওহে রাখাল!

রাখাল ॥ কি ভাই!

রাজদূত ॥ রাজার এক বন্ধু এখানকার ঐ ছবির গুহাতে ছবি আঁকতে এসেছিলেন, সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু শিবিরে ফিরে যান নি! রাজা চিন্তিত হয়ে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন,...তাঁকে দেখেছ?

রাখাল ॥ [চারিদিক দেখিয়া]...ঐ...ওখানে কে ব'সে রয়েছে না?

[দুইজনে চিত্রকরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিল—]

রাজদূত ॥—ঘুমিয়ে পড়েছেন।

রাখাল ॥ স্বপ্ন দেখছে...হাঁ, নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছে!

রাজদূত ॥ প্রভু! প্রভু! [চিত্রকরকে ডাকিয়া তুলিল। চিত্রকর সদ্যনিদ্রোত্থিতের মত চোখ মুছিয়া বিস্মিত ভাবে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন।]

চিত্রকর ॥...বেণুবাদিনী! বেণুবাদিনী!

[চঞ্চল হইয়া এ-দিকে ও-দিকে খুঁজিতে লাগিলেন ও চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন—।]

রাখাল ॥ আপনি কাকে খুঁজছেন?

রাজদূত ॥ আপনি কাকে ডাকছেন?

চিত্রকর ॥—বেণুবাদিনী। সে বেণু বাজাচ্ছিল,...ঐ তার ধবলী আর ঐ তার কাজলী...

রাখাল ॥ আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন!

রাজদূত ॥ আপনি স্বপ্ন দেখছিলেন!

চিত্রকর ॥ স্বপ্ন!...ঐ তার গাই চরছে···ঐ যে ধবলী...ঐ যে কাজলী!

রাখাল ॥ আপনার কথা বিশ্বাসের নয়! ওরা আমার গাই!

চিত্রকর ॥ [তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া] সে গুহার মাঝে লুকিয়েছে...হাঁ...নিশ্চয়! বেণুবাদিনী!

[উন্মত্তভাবে ডাকিতে ডাকিতে গুহার দিকে ছুটিলেন।]

রাজদূত ॥...এর অর্থ কি ভাই?

রাখাল ॥ ঐ যারা ছবি আঁকে, তারা স্বপ্ন দেখে দেখে পরে পাগল হয়ে যায়।

[দূর হইতে চিত্রকরের উন্মত্ত আহ্বান ভাসিয়া আসিতে লাগিল···]

"বেণুবাদিনী! বেণুবাদিনী"

রাখাল ॥ [বোধ করি বা তাহার গরুকেই ডাকিতেছিল] আয়! আয়!

[আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল "বেণুবাদিনী! বেণুবাদিনী! আয়! আয়!]

চিত্রকর ॥ বেণুবাদিনী! বেণুবাদিনী!

রাখাল ॥ আয়! আয়!

(যবনিকা)

শাক-তুলুনী

জসীম্ উদ্দীন

ও কার বউ এল আজ মটরখেতে শাক তুলিতে,
সবুজ মাঠে সোনার তরি কে এসেছে ভাসিয়ে দিতে।
সিঁদূর-ফাটা মুখ খানিরে হাঁটুর নীচে করে' নত,
কাঁচা ডগা ধরতে ধীরে সোহাগে সে হচ্ছে ক্ষত।
মুঠি মুঠি শাক তুলে সে লচ্ছে আপন কোঁচ'টী ভরি,
মন্মথ তার ফুলের ধনু বাঁকায় ঘন, মরি মরি!
ফাগ্-রাঙা-বউ মটরশুটী আব্‌ছা হাসে পাতার ফাঁকে,
শাক-ভাঙা-বউ নত হয়ে ঘোমটাতলে সিঁদুর আঁকে।
মটরশুটীর বাজে পাতা, বধূর হাতের বাজে চূড়ী,
বধূ দোলে সোহাগ ভরে, বাতাস দোলায় মটর কুঁড়ী।
চলতে পথে পথিক ভাবে, কার পানে বা ফিরাই আঁখি,
দিঘীর রাঙা নালের বনে রক্ত-মরাল ফিরছে নাকি?
পায়ের দু'খান খাড়ু নিয়েই গেঁয়ো বালার মহা বিপদ,
যতই টানে জড়িয়ে ধরে মটর শুটীর পাতার আপদ।
তারি মায়ায় থায় সে আছাড় লুটিয়ে পড়ে মটর ক্ষেতে,
বুকে মুখে ফুল গুলি সব জড়ায় ছোঁয়ার হর্ষে মেতে।
এমনি করে শাক তুলে সে গাঁয়ের পথে চল্‌ল ফিরে,
চল্‌ল যেন সোনার কলস ভাসিয়ে মাঠের সবুজ নীরে।

দুঃখবাদী

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

তারি 'পরে তব কোপ গো বন্ধু, তারি 'পরে তব কোপ,
যে জন কিছুতে গিলিতে চায় না এই প্রকৃতির টোপ্।
সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল,
গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি, সুন্দর ধরাতল ;—
ছবি ও ছন্দে তোমারি দালালি করিছে স্বভাব-কবি,
সম-সুন্দর দেখে তারা গিরি, সিন্ধু, সাহারা-গোবি !
তেলে-সিন্দুরে, এ সৌন্দর্য্যে 'ভবি' ভুলিবার নয় ;—
সুখদুন্দুভি ছাপায়ে' বন্ধু উঠে দুঃখেরই জয় !

অতল দুঃখ-সিন্ধু,—
হাল্কা সুখের তরঙ্গ তাহে নাচিয়া ভাঙিছে ইন্দু,
তাই দেখে যারা হয় মাতোয়ারা, তীরে ব'সে গাহে গান,
হায় গো বন্ধু, তোমার সভায় তাহাদেরি বহুমান !
দিগন্তপারে তরঙ্গ-আড়ে যারা হাবুডুবু খায়,
তাদের বেদনা ঢাকে কি বন্ধু তরঙ্গ-সুষমায় ?
বজ্রে যে জনা মরে,—
নবঘনশ্যামশোভার তারিফ্ সে বংশে কেবা করে ?

ঝড়ে যার কুঁড়ে উড়ে,—
মলয়ভক্ত হয় যদি, বল কি বলিব সেই মূঢ়ে !
ফাল্গুনে হেরি নবকিশলয় যারা আনন্দে ভাসে,
শীতে শীতে ঝরা জীর্ণপাতার কাহিনী না মনে আসে ;
ফল দেখে যার নাহি কাঁদে প্রাণ ঝরা ফুল-দল লাগি,—
তারা সভাকবি,—আমরা বন্ধু দুখবাদী বৈরাগী !

এই বিশ্বের ব্যবসার লাভ বন্ধু, তুমি ত জান,—
একা ব'সে যবে রাতের খাতায় দুঃখের জের টান।
জমাখরচের কৈফাৎ কেটে, বাকী যে ফাজিল কত,—
বাহিরে 'বিজ্ঞাপনে' যাই বল, অন্তরে বুঝিছ ত।
বজায় থাকিতে খ্যাতি,
সহসা জ্বালাবে কোন্ সন্ধ্যায় প্রলয়ের লাল-বাতি।
সুখে মোড়া দুখে ভরা কত বড় রচে'ছ গো কৌশল,
এ ব্রহ্মাণ্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন্ মাকাল ফল !
সৌন্দর্য্যের পূজারী হইয়া জীবন কাটায় যারা,—
সত্যের শাঁস কালো ব'লে, খাসা রাঙা খোসা চোষে তারা !
বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কিবা !
মায়াবিনী, নরে বিপথযাত্রী করিছে রাত্রি-দিবা।
চটকের কাছে শিখিব কি প্রেম ! বকের নিকট ধর্ম্ম !
সহজস্বাধীন হিংস্র শ্বাপদ শিখাবে জীবন-মর্ম্ম ?
অরণ্যতরু জপিছে গন্ধ-ঠেলাঠেলি অবিরাম ;
কুসুম-অলির অবাধপ্রণয়, উভয়তঃ কি আরাম !
বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আন্‌মনা,—
রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধ'রে রঙিন্ বারাঙ্গনা !

খাদ্যে-খাদকে, বাদ্যে-বাদকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য,—
ষড়ঋতু ছলে ষড়রিপু খেলে—কাম হ'তে মাৎসর্য্য !
ছলে বলে কলে দুর্ব্বলে হেথা প্রবল অত্যাচার ;
এ যদি বন্ধু হয় তব ছায়া, কায়া ত চমৎকার !

শুনহ মানুষ ভাই !
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই ।
যদিও তোমারে ঘেরিয়া র'য়েছে মৃত্যুর মহারাত্রি,
সৃষ্টির মাঝে তুমিই সৃষ্টি-ছাড়া দুখপথ-যাত্রী ।
তোমাদেরি মাঝে আসে মাঝে মাঝে রাজার দুলাল ছেলে,
পরের দুঃখে কেঁদে কেঁদে যায় শতসুখ পায়ে ঠেলে ।
কবি-আরাধ্য প্রকৃতির মাঝে কোথা আছে এর জুড়ি !
অবিচারে মেঘ ঢালে জল, তাও সমুদ্র হ'তে চুরি !
সৃষ্টির সুখে মহাখুসি যারা, তারা নর নহে, জড় ;
যারা চিরদিন কেঁদে কাটাইল, তারাই শ্রেষ্ঠতর ।
মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন্ সুখ ;
সত্য, সত্য, সহস্রগুণ সত্য,—জীবের দুখ ।
সত্যদুখের আগুনে বন্ধু,
পরাণ যখন জ্বলে,—
তোমার হাতের সখ-দুখ-দান
ফিরায়ে দিলেও চলে !

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের

সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

(মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

এই মাগধী ভাষা বহুকাল যাবৎ আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচ্য-ভাষা, অর্থাৎ পূর্ব্ব অঞ্চলের ভাষা বলে পরিচিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নিজ কানে শুনে গিয়েছেন যে, বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা এই তিন সুবায় একই ভাষা প্রচলিত ছিল।

শ্রীমান সুনীতিকুমার পুরোনো দলিলপত্র ঘেঁটে আবিষ্কার করেছেন যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বঙ্গভাষা বেহারী ভাষা থেকে পৃথক হয়, এবং সেই শুভক্ষণে সে তার স্বাতন্ত্র্য লাভ করে ; আর এতদিনে সে তার স্বরাজ্য লাভ করেছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা সেকেলে মহারাষ্ট্রী ভাষার মত পদ্যের দখলেই ছিল। মাত্র গত শতাব্দীতে গদ্য তাকে জবরদখল করে নিয়েছে। সংক্ষেপে আমাদের ভাষার বয়েস হাজার বৎসর, আমাদের গদ্য সাহিত্যের বয়েস একশ' বছর। এই ত হচ্ছে তার উৎপত্তির বিবরণ।

এখন তার প্রকৃতির পরিচয় নেওয়া যাক্। সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা আবিষ্কার করেছিলেন যে, দেশভাষা মাত্রই মিশ্রভাষা, কেননা সে সব ভাষা তিনটি উপাদানে গঠিত। সে তিনটি উপাদান তৎসম শব্দ, তদ্ভব শব্দ ও দেশী শব্দ। যে সব সংস্কৃত শব্দ আমাদের ভাষায় স্বরূপে বিরাজ করছে, তারাই তৎসম, যথা—"বিবাহ" ; যাদের চেহারা ফিরেছে, তারাই তদ্ভব, যথা—"বিয়ে" ; আর যাদের কুলশীল জাতিগোত্র জানা নেই, তারাই দেশী। আমরা আজ দেখ্‌তে পাই, এ তিন ছাড়া অনেক বিদেশী শব্দও বাঙালার অঙ্গীভূত হয়েছে। শ্রীমান সুনীতিকুমার গণনা করে দেখেছেন যে, আমাদের ভাষার অন্তরে অন্তত ২৫০০ ফার্সি শব্দ আর শ'-দুয়েক ইউরোপীয় শব্দ বেমালুম ঢুকে গিয়েছে। এতে যদি সে ভাষা যবনদোষে দুষ্ট হয়ে থাকে, তাকে সে দোষ হতে মুক্ত করবার কোন উপায় নেই। ভারতচন্দ্র বলেছেন—"অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল" ; আমাদেরও তাই করতে হচ্ছে, এবং হবে। সঙ্গীতের ভাষায় মিশ্র রাগিণীকে বলে জংলা। বঙ্গভাষা যদি জংলা ভাষা হয় ত আমাদের ঐ জংলারই চর্চ্চা করতে হবে।

(১০)

আমরা ভাষা নিয়ে পূর্ব্বে যে বাদানুবাদ করেছি, তা আসলে শব্দঘটিত কলহ। শুদ্ধি-বাতিকগ্রস্ত সাহিত্যিকরা চান যে, সাহিত্যের ভাষা থেকে প্রথমত দেশবিদেশী শব্দসমূহকে বহিষ্কৃত করা হোক, তারপর যতদূর সম্ভব তদ্ভব শব্দগুলিকে তৎসম করা হোক ; তাহলেই তার লুপ্ত পবিত্রতা পুনরুদ্ধার করা হবে। কারও পক্ষে "জুতো-খাওয়াটা" অবশ্য লজ্জার বিষয়, কিন্তু "বিনামা ভক্ষণ"টি কি হিসাবে সাধুজনোচিত, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। আর তদ্ভবকে তৎসম করা অসাধ্য। এত বড় গুণী কি

কেউ আছেন, যিনি "বামুন"কে ব্রাহ্মণ করতে পারেন, আর "বোষ্টম"কে বৈষ্ণব? আসল কথা এই যে, আমরা যদি এই অসাধ্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করি, তাহলে আমরা বঙ্গ-সরস্বতীকে কাঙাল করব। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্।—"বন্ধু, বঁধু ও ইয়ার," এ তিনের গূঢ় অর্থটি একই, অথচ এ তিনের অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এর কোনটিকে বাদ দেবার যো নেই, কিম্বা এর একটির স্থানে আর একটি বসাবার যো নেই। শুনতে পাই যে, কোমল গান্ধার সুরটি অতিশয় শ্রুতিমধুর। কিন্তু যেখানে "পা" লাগানো উচিত, সেখানে কোমল "গা" লাগালে সুর যাদৃশ সদ্গতি লাভ করে; যেখানে "বন্ধু" বসবে, সেখানে "ইয়ার" বসালে ভাষাও তেমনি সদ্গতি লাভ করে। সুতরাং সাহিত্যিকদের ছুঁৎমার্গ পরিহার করবার পরামর্শ আমি নির্ভয়ে দিতে পারি। শুনতে পাই, হিন্দু-সমাজের অস্পৃশ্যতা দূর করতে পারলেই আমরা স্বরাট হয়ে উঠব। এ মত কতদূর সত্য তা জানি নে, কিন্তু বঙ্গভাষায় অস্পৃশ্যতার চর্চ্চা করলে, বঙ্গ-সরস্বতী তার স্বরাজ্য হারিয়ে বসবে, সে বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ নেই। আপনারা শুনে খুসি হবেন যে, শব্দের কুল-বিচার না ক'রে তার অর্থ-বিচার করাই প্রাচীন পণ্ডিতদের অনুমত। ভরতচন্দ্র বলেছেন যে,—

"প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়েছেন কয়ে।
যে হোক্ সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়ে॥

ভারতচন্দ্রের এ কথা যে সত্য, তার প্রমাণ ভোজরাজ বলেছেন :—

"সংস্কৃতে নৈ কোঽপ্যর্থ প্রাকৃতেনৈব চাপরঃ।
শক্যো বাচয়িতুং কশ্চিদপভ্রংশেন বা পুনঃ॥"

আর ভোজরাজের চাইতেও অনেক প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্ডী বলেছেন :—

"তদেৎবাঙ্ময়ং ভূয়ঃ সংস্কৃতং প্রাকৃতং তথা।
অপভ্রংশশ্চ মিশ্রঞ্চেত্যাহুরার্য্যা চতুর্ব্বিধম্" ॥

এ স্থলে আপনাদের আর একটিবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বঙ্গ-সাহিত্যের, তথা বঙ্গ-ভাষার অতীত এমন লম্বাও নয়, বড়ও নয় যে, সেই অতীত গৌরব-কাহিনী শুনে আর বলে' আমরা দিন কাটিয়ে দিতে পারি। আমার বিশ্বাস আমাদের সাহিত্য তার গৌরব লাভ করবে ভবিষ্যতে। অতীত আমাদের কাছে পড়ে- পাওয়া জিনিষ—ভবিষ্যৎ কিন্তু আমাদের নিজ-হাতেই গড়ে তুলতে হবে। লেখকেরা সমাজের আনুকূল্য লাভ না করলে, এ ব্রত উদযাপন করতে সক্ষম হবেন না। আর সে আনুকূল্য যে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করবার আশা করতে পারি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই সভা।

(১৪)

আমি এতক্ষণ ধরে আপনাদের কাছে ভাষার বিষয় যে বক্তৃতা করলুম, তার কারণ মানুষের ভাষা তার মনের পরিচয় দেয়। আমরা যাকে ভাষার উন্নতি-অবনতি বলি, তা মনের উন্নতি-অবনতির বাহ্য নিদর্শন মাত্র। কোনও জাতির ভাষা যখন নবরূপ ধারণ করে, তখন বুঝতে হবে যে, সে জাতির মনও নবকলেবর ধারণ করেছে। তা ছাড়া ভাষার আলোচনা করা সহজ। ভাষা ভাবের স্থূল-দেহ, সূক্ষ্ম শরীর নয়; আর সকলেই জানেন যে, পৃথিবীর সব জিনিষের স্থূলদেহ নিয়েই নাড়াচাড়া করা সহজ, কারণ তা ধরা-ছোঁয়ার বস্তু। কোনও পদার্থের সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, মনোগ্রাহ্য। তাই কাব্যবস্তু কি, তার বিচার করতে হলে দর্শনের রাজ্যে ঢুকতে হয়। এ ক্ষেত্রে সে আলোচনায় হস্তক্ষেপ করা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা হবে, কারণ আমি এ সভার দার্শনিক শাখার সভাপতি নই। আর যদি বিদ্যা দেখাবার লোভে সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তাহলেও ধৈর্য্য ধরে আপনারা তা শুনতে পারবেন না। বাজারে গুজব এই যে, হিন্দুমাত্রেই দার্শনিক। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহলে তার অর্থ আমরা জাতকে জাত স্বভাব-দার্শনিক, স-তর্ক দার্শনিক নই। কিন্তু এ যুগের দর্শনের টানা-পড়েন দু-ই সমান তর্কে বোনা।

আপনারা বোধহয় জানেন যে, একালে আমরা যাকে সাহিত্য বলি, সংস্কৃত ভাষায় তার নাম ছিল কাব্য। এই 'সাহিত্য' শব্দ বাঙালায় কোথা থেকে এল জানি নে। ও